জাতীয় সমকিন্তন

রবীন্দ্র-সংখ্যা ১৪০১

শতাব্দীর প্রণাম

"বন্ধু হও, শত্রু হও, যেখানে যে কেহ রও।
ক্ষমা করো আজিকার মতো,
পুরাতন বরষের সাথে
পুরাতন অপরাধ যতো॥"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তেরশ এক সনের পয়লা বৈশাখ

স্মারক সংখ্যা :- ২০৭৫ (১৫), কে. তথ্য. ছাওকা। তারিখ :- ১৮-৫-১৪

জাতীয় সমহচিন্তন

রবীন্দ্র সংখ্যা ☐ চৈত্র-বৈশাখ ১৪০০-১৪০১
অষ্টম বর্ষ ☐ অষ্টম-নবম সংখ্যা ☐ এপ্রিল-মে ১৯৯৪
মূল্য টাকা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্র-প্রভাব ☐ সত্যেন্দ্র কুমার দে

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল : দুই জাতীয় কবি ☐ ডঃ শিশির কর

কবিতাগুচ্ছ : জ্যোতির্ময় সেই-নাম ☐ পলাশ মিত্র
রবীন্দ্রনাথ ☐ সমরেন্দ্র দত্ত রায়
বেলাভূমে দাঁড়িয়ে কেন ☐ শ্রীদুর্গা
রবীন্দ্রনাথ ☐ আনন্দ বাগচী
রবীন্দ্রনাথ : ১২৯৪ সুনীল বসু

রবীন্দ্রসদনে যীশু ☐ মনীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

পঞ্চতরঙ্গে : রবীন্দ্রনাথ ☐ ডঃ অরুণ সীল

রবীন্দ্রনাথ : এখনও প্রাসঙ্গিক ☐ রবীন্দ্রনাথ আচ

কবি প্রণাম ☐ শান্তিময় বিশ্বাস

কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ ☐ অরুণ কুমার দে

চিরকালের চিরসুন্দর রবীন্দ্রনাথ ☐ রাজীব কুমার মণ্ডল

কালান্তর ও রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনীতিতে সার্বভৌম মানবচিন্তা ☐ শক্তিপ্রসাদ রায়বর্মা

রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারী ☐ বিনয় সরকার ৫৪

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ☐ ডঃ অর্ধেন্দু বিশ্বাস
সহ-সম্পাদক ☐ পল্লব মিত্র
সম্পাদক ☐ শঙ্কর কুমার সাহাল
প্রকাশিকা ☐ শিখা সাহাল
মুদ্রক ☐ সুনীল কুমার দে, প্রিন্ট সার্ভিস, ৬১ নন্দন পাড়া রোড, খুলতী, হাওড়া-৭, ফোন : ৬৬৫-৬৪৭২
কার্যালয় ☐ ১৭/৩ নন্দন পাড়া রোড, খুলতী, হাওড়া-৭১১ ১০৭ ☐ ফোন : ৬৬৩-৬১৬১, ৬৬৩-৬৬২১
শাখা কার্যালয় ☐ বেলগাছিয়া ভিলা, ব্লক-৩৮, ফ্ল্যাট-৬, কলিকাতা-৭০০০৩৭ ☐ ফোন ৩৩৬-৩০২১

জ্যোতির্ময় সেই-নাম

পলাশ মিত্র

কোনও দিন পাবো না আমি
আকাশের নাগাল।
হাজারো সমস্যা আর
প্রাত্যহিক চিন্তার কাল
নিয়ে নিজেকে জড়াই,
তবু ওই নীলাকাশ
এবং শিশির বিন্দু
ঘাস-ফুল দখিনা বাতাস ;
এবং অজস্র কথা সহস্র স্ললিত গানে
আমার এই দগ্ধমনে আসে যায়
কি জানি ব্যাকুল কোনো টানে।

এই আসা—এই যাওয়া—এই গতিপথ
এর যদি দিই কোনো নাম—
সে-নাম রবীন্দ্রনাথ
জ্যোতির্ময় সে-নামে প্রণাম।

□

আমাদের কথা

আত্মম্বরূপ সূর্যসনাথ রবীন্দ্রনাথ

অর্ধেন্দু বিশ্বাস

সূর্য হইতে রৌদ্র, চন্দ্র হইতে আলো এবং নক্ষত্রমালা হইতে স্নিগ্ধ লাজুক নরম রশ্মিমালার সৃষ্টি ঠিক তেমনই আছে। সূর্যের চতুর্দিকে অবস্থান করিয়া যে গ্রহবৃন্দ তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহেনা, ভালোবাসার ফেরাটোপে রাখিয়া আজও তাহারা সূর্যের মুখ দেখিতেছে প্রতিদিন। কেবল সূর্যের ভালবাসাপ্রাপ্ত পৃথিবী নামক একটি গ্রহ সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ হইতে মাঝেমাঝে মুক্ত হইতে চাহে অর্থাৎ পৃথিবী পালিত তার দুর্মুখ সন্ততিরা একটা ভুল বিস্ফোরণের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আত্মঘাতী হইবার মরিয়া বাসনাকে কেবলই ঘটপট করিয়া মরিতেছে।

অথচ পৃথিবী দিয়াছিল কিংবা বলা যায় সূর্যই দিয়াছিল ইহাদের গ্রহ-নক্ষত্র পুঞ্জের আলোক, শতেক সবুজ বনভূমির ছায়াসুনিবিড় আশ্রয়, সুমিষ্ট নদীসমূহের জল, নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসের জন্য বিশুদ্ধ বাতাস, উড়িয়া যাইবার জন্য ব্যাপ্ত আকাশ, ভাসিয়া যাইবার জন্য সুবিস্তৃত সমুদ্র, দাঁড়াইয়া উঠিবার জন্য সুউচ্চ পর্বতমালা। তবুও কিছুতেই ভুলিলনা পৃথিবীর বালখিল্যরা। নির্বোধ ও অন্ধ হইবার বাসনায় ইহারা সূর্যপ্রদত্ত এই সব মহার্ঘ আলোকমালা এবং বস্তুপুঞ্জকে সুবিনীত শলাকা দিয়া খুঁচাইয়া খুঁচাইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিল, বনভূমি ধ্বংস করিয়া নগর বসাইল, নগরে বন্দী হইতে হইতে নিজেদের কয়েদে পরিণত করিল, নির্মল আলোকমালায় ধূলা ছড়াইতে ছড়াইতে তাহাদের আসিবার পথ বন্ধ করিল, বিষ ছড়াইয়া ছড়াইয়া নদীসমূহের বিশুদ্ধ জলকে হিংস্র করিয়া তুলিল, সুউচ্চ পর্বত-সদৃশকে চাঁছিতে চাঁছিতে খর্ব করিল এবং তীব্র হিংসায় প্রতিবেশী সুন্দর, সুরুচি এবং বিচিত্র জীবনগুলিকে নিশ্চিহ্ন করিতে মাতিয়া উঠিল; তাহার পর করিবার যখন আর কিছুই রহিলনা, তখন মহাক্রোধে কাঁদিতে কাঁদিতে কারুকার্যময় অস্ত্র সম্ভার প্রয়োগে নিজদেহকেই আঘাত করিতে করিতে দানবীয় উল্লাসে কাটিয়া পড়িতে লাগিল।

অপার করুণাময় সূর্য তখন অস্তিত্বহীনতার অবসাদে আক্রান্ত হতভাগা পৃথিবীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, যে ঐশ্বর্য দিয়াছি শুধুমাত্র তোমাকেই, চলিবেনা তাহাকে হেলাফেলা করা; তুমি হও রক্ষাকর্ত্রী নিজের, রক্ষা পাও সেইসব সন্তানদের

যাহারা রক্ষা করিবে তোমাকে, তোমার বেদনাদগ্ধ দুর্বিনীত হিংস্র এবং মৃতপ্রায় শান্তস্বভাব সন্ততিকে, আমি আশীর্বাদ করিতেছি তোমাকে, জয় হোক তোমার।

নিস্তব্ধ হতাশ পৃথিবী সচকিত আকাঙ্ক্ষায় তখন জন্ম দিলেন সেইসব সূর্য-লোকবাসী দেবতির মানুষের যাঁহারা রক্ষা করিবে বিদগ্ধতার অলোকসামান্যা মাতা পৃথিবী এবং তাহার মিত্র-প্রকৃতির সন্ততিদের। যুগ যুগান্ত ধরিয়া পৃথিবীর গর্ভের বর্ষনিধি গোপনকন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিতে লাগিলেন তাঁহারা। পুত্রকন্যাসহ পৃথিবী সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল ধীরে ধীরে; ইঁহাদিগের সঞ্জীবনী করস্পর্শে পৃথিবী পুনরায় ফিরিয়া পাইতে লাগিল তাহার শ্রুতনর্তন সৌন্দর্য।

ইঁহাদের ছলন ও করস্পর্শকে ফাঁকি দিয়া কিছু লোক হইয়া উঠিল কালা-পাহাড়: পৃথিবীর স্বর্গে যুগে যুগে ইহারা সৃষ্টিয়া তুলিল নানা রঙের নরকের উপনিবেশ। অসহায়া পৃথিবী মর্মান্তিক যন্ত্রণায় বিদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, আমি আত্মঘাতিনী হইব।

স্নিগ্ধ হাস্যে সূর্য তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আমার সৃষ্টি তুমি, তোমার যন্ত্রণার অবসান ঘটাইব আমি, আমিই আসিতেছি: 'কবিরেক প্রজাপতি' হইয়া তোমার কোলে জুড়িয়া; অকালে তুমি আত্মঘাতিনী হইবে কোন্ দুঃখে!

ভোরের পাখীর কাকলি আহ্বানে পৃথিবীর পূর্বদিগন্তে আবির্ভূত হইলেন নূতন দিনের সূর্য, মুখে তাঁহার ভুবন-ভুলানো হাসি, ডান হাতে তাঁহার সুরমূর্ছনার বাঁশী, অন্য হাতে দুর্জনদাহী কৃপাণ, দৈত চরণে নৃত্যের লীলাচঞ্চলতা, দ্যুতি বিলসিত সর্বাঙ্গে বহিল অমৃতস্রোতোধারার হিল্লোল। কখনও তিনি বাঁশী বাজান, কখনও তিনি বাঁশী রাখিয়া সৃষ্টিলীলায় মাতিয়া উঠেন। সাময়িক অভিধায় তিনি হইলেন 'কবিরেক প্রজাপতিঃ', সূর্যসনাথ তিনি হইলেন কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ। আমাদের জীবন মরণ, হাসি-কান্না, সুখ দুঃখ, মিলন-বিরহ—আমাদের সকল অভিজ্ঞানের গোপন কুঞ্জে তিনি প্রবেশ করিলেন আমাদের প্রাণের মানুষ হইয়া, বলিলেন, আমি আছি তোমাদের সর্বক্ষণায়, তোমরা আজ আমার সকল ভাবনায়, সকল গানের সুরে, আছি তোমাদের উৎসবে, আনন্দে, দুঃখের তিমির রাত্রে, আছি মৃত্যুর তীর্থ শ্মশানেও। নরকের উপনিবেশসমূহ হইয়া উঠিল পারিজাত-কানন তাঁহার কান্তকোমল অমৃত-করস্পর্শে।

পৃথিবী করুণাঘন আনন্দে বলিয়া উঠিল, আমি বাঁচিয়া উঠিলাম এবং কি সুন্দর বাঁচিয়া আছি এবং বাঁচিয়া থাকিতে চাই অন্তহীন কালস্রোতে। সূর্য বলিলেন, আমার সৃষ্টি তবে সত্যই বাঁচিয়া উঠিল আমারই কিরণ সম্পাতে। আমার আয়ু নিঃশেষ হইবার পূর্বে নিস্তাভাকর রহিল পৃথিবীর প্রতিটি ধূলিকণা।

'আত্মস্থ ব্রহ্মপ্রকাশ' রবীন্দ্রনাথ। তুমি আজ আমাদের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, আমাদের জৈবিক অণু-পরমাণুতে। এখন আমরা সহজেই উচ্চারণ করিতে পারি, লক্ষ কোটি গ্রহনক্ষত্রখচিত ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর পৃথিবীর মানুষ আমরা, এবং তুমি আমাদের মহারাজাধিরাজ। হে জ্যোতীশ্বর! অনন্ত হৃদয় লইয়া এবং বিগত প্রসারিত সৃষ্টি মুখ অনুভব করিয়া তোমারই মত যেন আমরা বলিতে পারি, হে বিশ্বযোনী! 'আমি তোমাদেরই লোক'।

আমাদের অস্তিত্বের অনির্বাণ আলোয় লিখা 'অবাঙ্মনসগোচর' রবীন্দ্রনাথ। তোমাকে প্রণাম।

রবীন্দ্র-প্রভাব

সন্তোষ কুমার দে

আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে,
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে। ....

এই ছড়া শুনে আমি বড়ো হয়েছিলাম। পরে যখন পাঠশালায় পড়তে গেলাম, সেখানে বর্ষা পরিচয়ে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' হ'তে শুরু করে প্রথম কবিতা পড়ি সেটি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের লেখা—

পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে,
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে। .....

শিশুসুলভের মতো আমিও মন দিয়ে এই কবিতা মুখস্থ করেছিলাম, যাতে ৭০ বছর পরেও তা স্পষ্ট মনে পড়ে। কিন্তু আমার মন কেড়ে নিল আগের ছড়াটি। সেটি আমায় শিখিয়েছিলেন আমার জেঠামশাই-জেঠাইমা। তা যে কোনও বইতেই পাওয়া যায় তা আমার ধারণাই ছিল না, তা যে রবীন্দ্রনাথের রচনা তা জেনেছিলাম অনেক কাল পরে। জেনে আরও বিস্মিত হয়েছিলাম—কবি কি তবে আমাদের গাঁয়েও কখনো এসেছিলেন? কারণ, ও-যে অবিকল আমাদের গাঁয়ের গা ঘেঁষে ব'য়ে যাওয়া নদীটির বর্ণনা। নদী নয় নদ, নাম ভৈরব নদ, কোনো কালে নাকি সে বিশাল আকারের স্রোত-প্রবাহ ছিল—যেখান দিয়ে ঠাকুর কোম্পানীর ষ্টীমার যেত। এ কালের বাস যেমন রাস্তার মোড়ে মোড়ে থেমে যাত্রী ওঠার আমার সেই রকম ঘুচরো যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করত 'পহনার' নৌকা। কথাটা মা-ঠাকুরমার মুখে শুনেছি। বোধ হয় শব্দটি 'পহনা' না হয়ে 'পাওনা' হতেও পারে। কারণ সেই বড় বড় নৌকার ছইয়ের তলায় যাত্রীরা ভিড় করে বসত। গল্প গুজব করত, হয়তো দূরের যাত্রীরা এক ছিলিম তামাক খেয়েও নিত। নৌকার মাঝি মাল্লাদের নিজেদেরও হুকো কলকে তৈরীই থাকত। তবে যাত্রীরা যাতে ঠিক সময়ে ঘাটে হাজির হয় তাই দূর থেকেই নৌকার কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে জানান দিত-যে নৌকা আসছে যাত্রী নিতে। জানবাজনার থেকেই হয়ত 'পাওনা, বা 'পহনা'র নৌকা নাম হয়ে থাকবে কিয়ারে যেমন ভেঁা বাজে সিঁটি বাজায় নৌকার তেমন কাড়া-নাকাড়া।

কালে কালে আমাদের গাঁয়ের পাশের 'ভৈরব নদ' শুকিয়ে অবিকল রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বর্ণিত 'ছোট নদী'তে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু নামটি তখনও ছিল ভৈরব। গরুবাছুর মানুষজন হরকার মতো হেঁটেই পার হতে পারত। তবে জোয়ারের সময় বড় বজরাও যেতে পারত। টাবুরে নৌকায় সবসময় যাতায়াত করতে হত।

সেকালের তুলনায় আমার জেঠামশাই বেশ সুশিক্ষিত ছিলেন। পোটা শুদ্ধকরীর আর্যা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। আমি একটু উঁচু ক্লাসে পাঠশালায় পড়বার সময় তিনি মুখে মুখেই আমায় শিখিয়েছিলেন।

কুতুবা কুতুবা কুতুবা লিখো
কাঠায় কুতুবা কাঠায় লিখো—ইত্যাদি।

ভণিতার মাপ 'কাঠাকালি'। শুভঙ্করীর মতো সুন্দর হরার-বন্ধ পাটিগণিতের নিয়মগুলি একালের ছাত্রেরা জানেই না। জোঠামশাই শুনেছি ডাকঘরে কাজ করতেন, সেই কালে বদলির চাকরি ছাড়াও কে আর দেশ-বিদেশে যেত? জোঠামশাই কিছুকাল ছিলেন 'বদ্যিনাথে'। বড় হয়ে বৈদ্যনাথ ধামে বেড়াতে গিয়ে খুঁজেছি আমার জোঠামশাই-এর কর্মস্থল। পাইনি, কারণ বৈদ্যনাথ তো শহর। জোঠামশাই থাকতেন তখনকার এক অজ পাড়া গাঁয়ে। তাঁর বর্ণনা শুনে মনে হত রবীন্দ্রনাথের লেখা পোস্টমাস্টারের গল্প। ডাকঘরে থাকবার জন্যই 'হিতবাদী' 'সঞ্জীবনী' এইসব কাগজ জোঠামশাই দেখতে পেতেন। নিজেও কিনতেন। নিজের পড়া হয়ে গেলে আমার সে কাগজ আমার বাবাকে তাকেই পাঠিয়ে দিতেন।

আমার ছোটবেলায় ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলার ফল শুনবার জন্য কৌতূহলী পড়শিরা আমাদের বাড়ি ভিড় করতেন। একজন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়তেন আর সবাই পাঠককে ঘিরে বসে শুনতেন। পড়া শেষ হলেও শোনা শেষ হত না। টিকা-টিপ্পনি চলতেই থাকত। আমাকে টানতে টানতে সেই মজলিস অনেকক্ষণ ধরে চলতে দেখতাম।

জোঠামশাই যখন চাকরি থেকে অবসর নিয়ে দেশে ফিরলেন তখন আমি নিতান্ত নাবালক। তিনিই আমার হাতে খড়ি দিয়েছিলেন এবং তালপাতায় অ-আ, ক-খ লেখাতেন। পাকা তাল-পাতা জলে ভিজিয়ে চিরে চিরে লম্বা পাতাগুলি দুদিকে সমান মাপে ছেঁটে তাকি বেঁধে রাখা হত। তার থেকেই তো 'পাতাতাড়ি' কথাটার উৎপত্তি। সেই পাতায় কিনেমরি লোহা দিয়ে লিখে ঝুনো কালি বুলিয়ে নিলে সে লেখা ছাপার মত ফুটে উঠত। তার উপর কাঠকয়লার/ভুসো কালি দিয়ে কল্কি কলমে মরবার মুখী ধারা বুলিয়ে লেখা শক্ত করতাম। পাঠশালায় যাবার আগেই আমার হাতের লেখা অ-আ, ক-খ শক্ত হয়ে গিয়েছিল। তবু নিয়ম রক্ষার জন্য প্রথম শ্রেণীর ছাত্র হয়ে আমাকেও মাটির দোয়াতে কালি ভরে দড়ি বেঁধে তার হাতের আঙুলে ঝুলিয়ে বাম হাতে পাত-তাড়ি আর বর্ণ পরিচয় এই নিয়ে পাঠশালায় যেতে হত। খেলার সাথীদের সঙ্গে যাতে পাততাড়ি বদল না হয়ে যায় তাই আমার মা তার শাড়ির রঙীন পাড় দিয়ে আমারটাকে চিহ্নিত করে দিতেন।

জোঠামশাই-এর সংগ্রহে কিছু বই ছিল। তিনি রোজই কোন-না-কোন বই পড়তেন। একটু বড় হলে আমি বুঝি-না-বুঝি সে সব বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম। তার মধ্যেই ছিল 'সোনার-তরী' 'নৈবেদ্য' এই সব ছোট আকারের কবিতার বই। জোঠামশাই আমার মুখস্থ করিয়েছিলেন—

গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা
কূলে একা বসে আছি নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা খর পরশা,
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

এও যে একেবারে আমার চোখে দেখা নদীর চরের চাষীদের ধানকাটার বাস্তব চিত্র। আমার শিশু মনে ছন্দের যাদুস্পর্শ এভাবেই লাগল।

আর একটু বড় হলে জ্যেঠামশাই শিখিয়েছিলেন—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জল সিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ-রভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।

তারপর যখন শিখলাম এবং গোটা কবিতাটি আবৃত্তি করে স্কুলে প্রাইজ পেলাম সে কবিতাটি হল—

'মনে করো, যেন বিদেশ দূরে
মা-কে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে।

তাতে যে 'হাঁরে রে রে রে রে' করে ডাকাতেরা ছুটে এলো আর 'বীরপুরুষ' ঘোড়ায় চড়ে ডাকাতের সঙ্গে লড়াই করল 'ঢাল তরোয়াল ঝনঝনিয়ে বাজে' সে শব্দ যেন কানে শুনতে পেতাম। তারপর যখন কবিতা শেষ হত গল্পের ওপর ফাঁস করে দিতে—

ছোট্ট কত কী ঘটে যাহা তাহা
এমন কেন সত্যি হয়না আহা

তখন আমার ভারি আপশোস হত।

সত্তর বছর আগের এই সব ঘটনা কেন আজ আমার মনে পড়ছে তার কারণ আজই চিঠি পেয়েছি, আমার বড় বোন ১০ বছর বয়সে মারা গেছেন। তিনি আমার জ্যেঠামশাই এর একমাত্র সন্তান ছিলেন। তাই আমরা ভাই বোন একলাতে মানুষ হয়েছিলাম। আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে জ্যেঠতুত খুড়তুত ভাইবোনেরা সবাই সহোদর ভাইবোনের মতই ছিলাম। দিদিমণিকে আমার বাবা-মা এত ভাল বাসতেন-যে সেকালের নিয়মমত বাবা চেষ্টা করে দিদিমনির এমন কুলীন পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন যিনি শ্বশুরবাড়ি হয়ে আমাদের বাড়িতেই থাকবেন এমন ব্যবস্থা হল। কিন্তু কেন জানিনা জ্যেঠাইমা মারা যাওয়ার পর জ্যেঠামশাই তাঁর অত প্রিয় মেয়ে জামাইকে নিয়ে একসঙ্গে থাকতে রাজি হলেন না। তাঁরা আমাদের কাছাকাছিই বাড়ি করে পৃথক সংসারে গেলেন। বাবাই সে বাড়ি তৈরী করে দিয়ে ছিলেন জ্যেঠামশায়ের নির্দেশে। আমাদের জামাইবাবু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমাদের বড় ভাইয়ের মতই ছিলেন।

বড় জ্যেঠামশাই-এর বই পত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখি একটি বইয়ে রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রের পাশে দাগ দেওয়া। পড়ে দেখি, সেটি তিনি লিখেছিলেন তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা মীরা দেবীকে। লেখাটি পড়ে মনে হয় যেন একটা আলোর সন্ধান পেলাম। জ্যেঠামশাই কেন দিদিমণিকে আলাদা বাড়িতে পাঠিয়েছিলেন এ যেন অবিকল তাঁরই মৌলিকত।

দাগ দেওয়া অংশটি এই—

"কোনও একটা বিশেষ কিছু ঘটেছে বলে তোকে আলাদা বাড়িতে যত্ন হতে বলছি এটা ঠিক নয়। বিশেষ কারণ ঘটলে তখন সেটা বিপদ হয়ে দাঁড়ায়।

আমি নিজে যতদূর সম্ভব রবীন্দ্রের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থাকি তার কারণ এ নয় তাঁদের সঙ্গে কোনো বিরোধ আছে। কিন্তু খুব আত্মীয় হলেও পরস্পরের মধ্যে একটা ফাঁক থাকা উচিত—সেটা স্বাস্থ্যকর, শান্তিকর। নিজে স্বাধীন থাকলে অন্যকে স্বাধীনতা দেওয়া যায়।"

যাঁরা কস্মিনকালে কবিকে চোখে দেখেন নি শুধু তাঁর লেখা পড়েই কিভাবে কত ব্যক্তিজীবন এমনভাবে প্রভাবিত হয়েছে তার হিসাব কে জানে? আমার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার জেঠা-মশাইকে দেখবার। যিনি রবীন্দ্রনাথকে চোখে না দেখলেও তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর শুভ প্রভাবে শুধু তাঁর নয় আমাদেরও প্রভাবিত করেছিলেন।

সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামের সম্পদই ভারতবর্ষের জাতীয় সম্পদের বৃহত্তর অংশ। শুটিকয় মহানগরীর জৌলুস তার ভগ্নাংশ মাত্র। গ্রামের মানুষের কর্মনিযুক্তির মাধ্যমে আমরা সেই সম্পদ সৃষ্টির কাজে নিরলস প্রয়াসী।

তাই, গ্রামের উৎপাদন বেশী করে কিনে দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন।

চন্দ্রকান্ত ললিতমোহন রেশম খাদি প্রতিষ্ঠান

(খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন কর্তৃক প্রমাণিত)

বহরমপুর, (পোঃ খাগড়া, জেঃ মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)

ফোন : BHB-(০৩৪৮২) ২০২০৮ গ্রাম : 'CHANDAKAN

(শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাজার)

কলকাতায় আমাদের বিক্রয় ভাণ্ডার :

খাদি সিল্ক এম্পোরিয়াম

১নং সেক্সপীয়ার সরণি, কলিকাতা-৭০০০৭১

ফোন : ২৪২-১১১৮ / ৪৭৩-৬০৩৭

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল : দুই জাতীয় কবি

ড: শিশির কর

জাতীয় কবির সুদুর্লভ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন দুই কবি, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। রবীন্দ্রনাথ ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশেরই জাতীয় কবি। আর নজরুল শুধু বাংলাদেশের। এঁরা দু'জনেই অনেক দেশাত্মবোধক কবিতা লিখে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন মুক্তি সংগ্রামে। দু'জনের প্রতিটি পদে রাজশক্তির কোপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্ববন্দিত কবির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে রাজশক্তির সাহস হয় নি। প্রতিবাদী কবি নজরুলের জেল হয়েছিল এই দেশাত্মবোধক লেখার জন্যই। নজরুল যখন হুগলি জেলে অনশনে দিন কাটাচ্ছেন, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'বসন্ত' নাটকটি উপহার দেন। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছিলেন, 'নজরুলকে আমি 'বসন্ত' গীতিনাট্য উৎসর্গ করেছি এবং উৎসর্গপত্রে তাঁকে কবি বলে অভিহিত করেছি। জানি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটা অনুমোদন করতে পারনি। আমার বিশ্বাস, তারা নজরুলের কবিতা না পড়েই এই মনোভাব পোষণ করছে। আর পড়ে থাকলেও তার মধ্যে রস ও রসের সন্ধান করেনি, অবজ্ঞাভরে চোখ বুলিয়েছে মাত্র।" (নজরুল একাডেমি পত্রিকা, হেমন্ত, ১৩৯০, পৃঃ ৮)

সেযুগে যখন অনেকে নজরুলের লেখার তীব্রতা'কে কাব্যের পরিপন্থী বলে সমালোচনায় মুখর, তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাদর স্বীকৃতি দিয়ে বলেছিলেন, 'তীব্রতাও রসাত্মক বাক্য হলেই কাব্য হয়ে ওঠে। যেমন উঠেছে নজরুলের বেলায়।' (ঐ, পৃঃ ৮)

রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে 'বসন্ত' নাটকটি উৎসর্গ করেন ১৩২১ সনের ১০ ফাল্গুন। উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল : 'প্রীতিভাজনেষু, ফাল্গুন, ১৩২১'

রবীন্দ্রনাথ হুগলি জেলে অনশনরত নজরুলকে বইটি পৌঁছে দেন নজরুল-সুহৃৎ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে। সেই সময়েই নজরুলের অনশনে উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের টেলিগ্রাম : 'Give up hunger Strike. Our literature claims you.' এই শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্র-আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে 'ধূমকেতু'র আবির্ভাব :

'কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু
আয় চলে, আয় রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ, অগ্নি-সেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গ-শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে তন্দ্রা মেরে
আছে যারা অর্ধ চেতন'।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৪-এ শ্রাবণ, ১৩২১

একবার নজরুল-পরিচালিত 'লাঙল' পত্রিকাতেও রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ দেন :

"বর হাল বলরাম আন তব রুক্ষভাষা হল
বল দাও, ফল দাও, শুভ হোক বার্থ কোলাহল।"

১৯২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর 'লাঙল' বের হয়।

নজরুল রবীন্দ্রনাথকে তাঁর 'সঞ্চিতা' কাব্য গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন ১৯২৮ সালে। তাতে লেখা :
'বিশ্বকবি সম্রাট শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু'

'যমন্ত' নাটকের বছর পাঁচেক পর 'সঞ্চিতা'র প্রকাশ। প্রথম সংস্করণটি বের হয় ১৯২৮ সালে। কলকাতার বর্মন পাবলিশিং হাউস থেকে প্রথম সংস্করণটি বের হয়। পত্রের ওলি ডি. এম. লাইব্রেরী থেকে।

আমাদের যুক্তি সংগ্রামে দুই কবিই প্রেরণা যুগিয়েছেন। উদ্বুদ্ধ করেছেন। তবে নজরুল ছিলেন তীব্রভাবে সমাজ সচেতন। আর আজীবন রোমান্টিক হলেও রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সমাজ-সচেতন। এই দুই কবি সম্পর্কে আর এক কবি বলেছেন :

'নজরুলের ছিল দৃপ্ত কণ্ঠস্বর, অব্যবহিত আঘাতের শক্তি, তাই রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিদের মধ্যে তাঁকেই উজ্জ্বলতম সেতু বলে মনে হয়।'

(বুদ্ধদেব বসু : 'কালের পুতুল')

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রযুগে অন্যেও বলিষ্ঠভাবে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়েছেন নজরুল—একমাত্র নজরুল বললেও ভুল বা বাড়াবাড়ি হবে না। আর রবীন্দ্রনাথের মতোই তাঁর সৃষ্টি সর্বতোমুখী। যদিও তাঁর রচনা-কাল রবীন্দ্রনাথের এক-তৃতীয়াংশের কম। বছরের বিশ/পঁচিশ বছর। রবীন্দ্রযুগের কবিদের মধ্যে একমাত্র নজরুলের লেখাতেই দেখা দিয়েছে এই বৈচিত্র্য ও বহুমুখিতা। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক সংক্ষিপ্ত সাহিত্য জীবনেও তিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই কবিতা, গান, হাসি ও ব্যঙ্গকৌতুক, গল্প, উপন্যাস, নাটক ও নানা রকম প্রবন্ধ লিখে সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা সাহিত্যকে। প্রচণ্ড রবীন্দ্র প্রভাবের যুগে থেকেও তিনি স্বকীয় প্রতিভার ছাপ রেখেছেন বাংলা সাহিত্যের সমস্ত শাখা-প্রশাখায়। রবীন্দ্রনাথও সানন্দে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনিই বোধহয় বাংলার একমাত্র জীবিত কবি যাঁকে রবীন্দ্রনাথ নিজের বই উৎসর্গ করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে নজরুল নিজেই কবির এই দান স্বীকার করেছেন :

'দেখেছিলো যারা শুধু মোর উচ্ছৃঙ্খল,
অশান্ত রোদন দেখা দেখেছিলে তুমি।
হে সুন্দর, বহ্নি-দগ্ধ মোর বুকে তাই
দিয়াছিলে 'বসন্তের পুষ্পিত মালিকা'।'

রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে ভাষা ব্যবহারে, ভাব-প্রকাশে সংযত হতে বলেছিলেন এবং সেজন্য পরিহাসও করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সেই উপদেশ নজরুল স্মরণে রেখেছিলেন। পরে সে সম্পর্কে নজরুল লিখেছিলেন :

"বলেছিলে হেসে একদিনে,
"ভরবারি দিয়ে তুমি চাহিতেছ বাঁধি!
যে জ্যোতিঃ করিতে পারে জ্যোতির্ময় ধরা
সে জ্যোতিরে অগ্নি করি হ'লে পূজ্য-কেতু!"
হাসিয়া বলিলে পরে, "এই যশঃ খ্যাতি
মাতালের নিত্য সাথী সেনার মতন।
এ সকল না পেলে মন যায় যায় করে
মধুর ভৃঙ্গারে কেন কর মদ্যপান?"

(অঞ্জ পুষ্পাঞ্জলি)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই উপদেশ, এই সাবধান-বাণী নজরুল মানতে পারেন নি। সমকালীন সমাজ ও দেশের প্রতিনিধিত্বই ছিল তাঁর কবি-ধর্ম। তিনি ছিলেন নিজ জাতি ও যুগের প্রতিনিধি। তাই অসংখ্য সাময়িক ব্যাপার, ঘটনা—কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, এমন কি ধর্মীয়—হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার বিষয় বস্তু। তবে শাশ্বত, চিরন্তন সত্যের কথা, প্রকৃতির সৌন্দর্য ও ভাবাবেগও তাঁর সৃষ্টিকে সমৃদ্ধিত করেছে। যশের নেশায় তাঁর কবি প্রতিভার চিরকালের মধু-ভাণ্ড কি হেলায় নষ্ট করেছেন তিনি? নজরুল নজরুলই। সব-সাময়িকতার উর্ধ্বে তাঁর সৃষ্টি স্বীকৃতি পেয়েছে বলেই আজ বাংলাদেশের জাতীয় কবি তিনি। শুধু এপার ওপার বাংলার নয়, সারা পৃথিবীর বাংলা ভাষাভাষীরা আজও শ্রদ্ধার ডালি নিয়ে পালন করে তাঁর জন্মদিন। আজও অত্যাচার, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতা আমাদের প্রেরণা দেয়, আমাদের কণ্ঠে দেয় প্রতিবাদের ভাষা। নজরুলের কবিতা আজও বিশ্বের অত্যাচারিত, নির্যাতিত, উৎপীড়িত মানুষের সংগ্রামের হাতিয়ার। তাই একটা বিশেষ যুগের কবি হয়েও তিনি যুগোত্তীর্ণ, তিনি দেশ-কালের সীমার উর্ধ্বে।

নজরুলের ভাষা বিদ্রোহের, প্রতিবাদের, সংগ্রামের, কারার লৌহ কপাট ভাঙার ভাষা। রবীন্দ্রনাথের মতো মার্জিত, মধুর, শান্ত ভাষার তিনি 'আবহমানের ঘা' দিতে চান নি। উল্কা এনেছিলেন তাঁর বাক্যে, ছন্দে। উদ্দাম ও কঠোর তাঁর লেখনী। এক সমালোচকের ভাষায়:

"রবীন্দ্রনাথের শান্ত-সমাহিত কবি-সুলভ জীবনবোধ নজরুল এড়িয়ে গেলেন, তাঁর কবিতা উদ্দাম, উদ্ধত ও অগ্নিগর্ভ; রবীন্দ্রনাথ বলতে গেলে, আদ্যন্ত মসৃণ, কোমল, ললিত। কোমলতা নজরুলে নেই এমন নয়। বিশেষতঃ প্রেমের কিছু সংখ্যক কবিতায় ও গানে তিনি অত্যন্ত কোমল—বলা যেতে পারে, সীমাহীনভাবে ভাববিহ্বল। কিন্তু বেশীর ভাগ তিনি উদ্ধত, উদ্দাম ও প্রগলভ; তাঁর উচ্চকণ্ঠস্বর বিদ্রোহীর গর্জন ছাপিয়ে উঠেছে, তাঁর অট্টহাসিতে চমকে উঠেছেন বেদনাবিহ্বল-বাসিনী বীণাপাণি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিয়েছেন প্রার্থনার ভাষা, নজরুল দিয়েছেন প্রতিবাদের ভাষা।" (নজরুল কাব্য সমীক্ষা, আতাউর রহমান, মুক্তধারা (ঢাকা) পৃঃ ১৪) সমালোচক আতাউর রহমানের এই মন্তব্য যথার্থই; যদিও রবীন্দ্রনাথের ভাষা কোমল থাকেনি সর্বত্র—বিশেষ করে 'বলাকা'য় যেখানে তিনি আমাদের বীর চঞ্চলীল জীবনকে মৃত্যুর গর্জন শুনিয়েছেন।

রবীন্দ্রমানসে যীশু

মনীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

রবীন্দ্রমানসে যীশুর ছবিটি কেমন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে হ'লে আমাদের পড়তে হবে রবীন্দ্ররচিত ছয়টি প্রবন্ধ বা বাণী এবং কতগুলি কবিতা। প্রবন্ধগুলি এবং কবিতাগুলি রচিত হ'য়েছিল যীশুর জন্মদিন বা বড়োদিন উপলক্ষে। প্রবন্ধগুলির নাম ও রচনা-কাল নিম্নে উদ্ধৃত করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি।

	প্রবন্ধ	রচনাকাল
১।	যীশুচরিত	২৫শে ডিসেম্বর, ১৯১০
২।	খৃষ্ট ধর্ম	২৫শে ডিসেম্বর, ১৯১৪
৩।	খৃষ্টোৎসব	২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৩
৪।	মানবসঙ্ঘের দেবতা	২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২৬
৫।	বড়োদিন	২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩২
৬।	খৃষ্ট	২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৩৬

বড়োদিন উপলক্ষে রচিত এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যীশুর সারলা, যীশুর সহজ বাণীগুলি এবং সেই সঙ্গে তাঁর ক্রুশবিদ্ধ অবস্থার হাসিমুখে আত্মত্যাগ অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন / শুধু তাই নয়। ভারতবর্ষের মূল চিন্তাধারার সঙ্গে যীশুর সরল বাণীগুলির মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন।

যীশুকে রবীন্দ্রদৃষ্টিতে আমরা শুধু মহাপুরুষ হিসাবেই দেখি না। আমরা যীশুকে পাই কখনো 'মানবপ্রেমিক,' কখনো 'মহামানব,' আবার কখনো 'মানবপুত্র' হিসাবে।

যীশু জন্মেছিলেন এক অখ্যাত গ্রামের প্রান্তে পশুরক্ষণশালায়। —ৎ কোন পণ্ডিতের ঘরে নয়, কোন রাজার প্রাসাদে নয়, কোন ঐশ্বর্যশালী রাজধানীতে নয়, কোন মহাপুণ্যক্ষেত্রে তীর্থস্থানেও নয়। যারা বাপ ঘরে জীবিকা অর্জন করত এমন সব কয়েকজন ইহুদি যুবক যীশুর শিষ্য হ'য়েছিল। কিন্তু যেদিন যীশুকে রোমরাজ্যের প্রতিনিধি অনায়াসেই ক্রুশ বিদ্ধ করার আদেশ দিলেন, সেই দিনটি বিশ্বের ইতিহাসে চিরদিন বন্ধ হবে, এমন কথা সেদিন কেউ ভাবতে পেরেছিল কি? রবীন্দ্রনাথ বড়োদিন উপলক্ষে ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৩২ তারিখে বলেছিলেন— "আমাদের জীবনে তাঁর (খৃষ্টের) জন্মদিন হৈবাৎ আসে, কিন্তু ক্রুশে বিদ্ধ তাঁর মৃত্যু সে তো আসে দিনের পর দিন। 'আজ বিশেষ দিনে দেশে-দেশে গির্জায়-গির্জায় তাঁর স্তবগান উঠছে, যিনি পরমপিতার বার্তা এনেছেন মানবসন্তানের কাছে—আজ সেই গির্জার বাইরে রক্তাক্ত হয়ে উঠছে পৃথিবী ভ্রাতৃহত্যায়।" খৃষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের এই নির্ভীক স্পষ্টোক্তি আজও কত সত্য। রবীন্দ্রনাথের মতে বড়োদিন পরিতাপ করার দিন, আনন্দ করার নয়। মানুষের লজ্জা সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করে আছে। সুতরাং "বড়োদিন নিজেকে পরীক্ষা করার দিন। নিজেকে নম্র করবার দিন।"

রবীন্দ্রমানসে যীশুর যে রূপটি শ্বেত পদ্মের ন্যায় সমুজ্জ্বল, সেটি হ'চ্ছে যীশুর 'মানবপুত্র' রূপ। কখনও এই মহাত্মা মানবসমাজে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরকে পিতা বলেছেন। পিতার সঙ্গে পুত্রের যে সম্বন্ধ তা আত্মীয়তার নিকটতম সম্বন্ধ। আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ। তাই ঈশ্বরের পুত্ররূপে মানুষ সকলের চেয়ে বড়ো। —সাম্রাজ্যের রাজারূপে নয়। যীশু মানুষকে দেখেছেন বড়ো করে, এবং মানুষকে করেছেন সম্মানিত। যীশু মানুষকে পরমপিতার সন্তান বলে, তাইকে মিলতে বলেছিলেন ভাইয়ের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন যে, বেদমন্ত্রে আছে ঈশ্বর আমাদের পিতা; পিতা নোঽসি। প্রার্থনা আছে: পিতা নো বোধি। তিনি যে আমাদের পিতা এই বোধ যেন আমাদের থাকে। সেই পিতার বোধ দান করতেই যীশু নিজের প্রাণ দান করেছেন উপনিষদে মানুষকে অমৃতের সন্ধান বলে উপলব্ধি করা হয়েছে। সপ্তর্ষিরা মরমিয়া বাংলার কবি চণ্ডীদাসও বলেছেন—সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। যীশু এই মানুষকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে পৃথিবীর মানুষ, বিশেষ ক'রে খৃষ্টধর্মাবলম্বীগণ, অন্তরে যখনে মৃত্যুশূল-বিদ্ধ কারুনিকের আর্তধ্বনি করে। কবি প্রশ্ন করেছিলেন—"২৫শে ডিসেম্বর তারিখে কিসের উৎসব? কেমন করে জানব খৃষ্ট জন্মেছেন পৃথিবীতে? আজও তিনি প্রতি মুহূর্তে ক্রুশ বিদ্ধ হচ্ছেন?" এই কথাই কবি তাঁর 'মানবপুত্র' শীর্ষক কবিতায় ১৩৩১ সালে বলেছিলেন নূতনভাবে—

"মৃত্যুর পাত্রে খৃষ্ট যেদিন মৃত্যুহীন প্রাণ উৎসর্গ করলেন
রবাহূত অনাহূতদের জন্য
তারপরে কেটে গেছে বহুশত বৎসর।"

কিন্তু সেকালেও মানুষ ক্ষতবিক্ষত হ'ত যে সমস্ত পাপের আঘাতে আজ তাদের নাম। মারবাস্ত্রের কলায় শান দেওয়া হ'চ্ছে "কত বড়ো মরীমুষকেতন কারখানায়।"

"খৃষ্ট বুকে হাত চেপে ধরলেন—
বুঝলেন, বোধ হয়নি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুর।

* *

সেদিন তাঁকে মেরেছিল যারা
ধর্মমন্দিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে
তারাই আজ নূতন জন্ম নিল দলে দলে।
... ... — ... ...
পূজামন্ত্রের সুরে ডাকছে যাশুক সৈন্যকে
বলছে, মারো। মারো।
যন্ত্রণায় মানবপুত্র যীশু বলছেন, "হে ঈশ্বর,
হে মানুষের ঈশ্বর, কেন আমায় ত্যাগ করলে?"

অন্য আর একটি কবিতায় কবি যীশুর দুঃখাভিভূত বিষণ্ণ মুখশ্রী উদার বিচারের মহিমায় মুকুটিত রূপটি তুলে ধরেছেন। যীশু যেন বলছেন—

"আমার এই ভাইয়েদের মধ্যে
তুচ্ছতমের প্রতি যে নির্মমতা—
সে আমারই প্রতি।"

এত বয়স দিয়ে একাগ্রভাবে যীশুকে অনুভব করা প্রতিভাশালী কবি রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৩৬ সালে শান্তিনিকেতন থেকে বড়োদিন উপলক্ষে একটি বাণীতে বলেছিলেন যে মানুষের সমাজে যুগের বড়ো মহামানব যদি মানুষের মধ্যে না জন্মাত তবে এই পৃথিবী এই কলুষতাময় এবং দানবলীলায় পৃথিবী অভিশপ্ত হ'য়ে থাকত, সমস্ত সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যেত, সমস্ত মানবলোক অন্ধকারে অবলুপ্ত হ'ত।

আমরা সকলেই আজ আর একটি যীশুর অভ্যুদয়ের শুভ মুহূর্ত কামনা করি। নূতন ক'রে যীশুর জন্ম হোক এই পৃথিবীতে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমরাও কামনা করি, সত্য সত্যই আলোর বড়োদিন আসুক। মানুষের মন বড়ো হোক।

রবীন্দ্রনাথ

সমরেন্দ্র দত্ত রায়

রবীন্দ্রনাথের কথা যুগে যুগে কেরে সকলের
রবীন্দ্রনাথের গান ঘরে ঘরে জ্বালায় আলোক
রবীন্দ্রনাথের ছবি খেয়ালীর খেয়ালী খেয়ালে
খেয়ায় খেয়ায় সর্বে বিশ্বের বিমুগ্ধ চোখ।

রবীন্দ্রনাথের নাম বিজয়ন পঁচিশে বৈশাখ
আদিগন্ত মধুময় মধুময় পৃথিবীর ধূলি
জনমে মরণে রণে জীবনের নিত্য জয় ঢাক
মানুষে মানুষে প্রেম জন্মে জীবে শিবে কোলাকুলি।

কবির রবীন্দ্রনাথ চিন্তায় চিত্তে চেতনায়
হিরণ্ময় পাত্রে ঢাকা অপরূপ সত্যের মুখ
কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সময়ের দুঃখ বেদনায়
শাশ্বত শান্তির সুখ সুধা পূর্ণ মুক্ত মুক্ত বুক।

পঞ্চতরংগ ঃ রবীন্দ্রনাথ

ডঃ অরুণ শীল

এক

চৈতন্য মহাপ্রভুর অব্যবহিত পর কয়েক শতাব্দী বাঙালী চিত্তকে সঞ্জীবিত রেখেছিল মহাপ্রভুর আধ্যাত্মিক দর্শন। পর পর দুই শতাব্দীর পাশ্চাত্য প্রবাহ বাঙালী চিত্তকে নূতন করে আলোড়িত করতে শুরু করেছে। এই অভিঘাতে বাঙালী-চিত্ত ও আধ্যাত্মিকতা নূতনভাবে এক মহাতরংগ সৃষ্টি করেছে। এই মহাতরংগেরই প্রকাশ পাঁচটি বিভিন্নমুখী তরংগে, একটি সামগ্রিক প্রকাশে।

দুই

প্রত্যেক তরংগের ব্যঞ্জনাতেই এক বিশিষ্ট আধ্যাত্মিকরূপ ফুটে উঠেছে। একটি বিশেষ আধ্যাত্মিক হৃদয়কে সেই-তরংগ আপন-ভাবনায় গ্রহণ করেছে। তার সমগ্র ভাবনা ও মানসিকতা সেই পুরুষের ওপরেই সমাবিষ্ট থেকেছে। এক এক জন মহাপুরুষ, আধ্যাত্মিক পুরুষও বটে, সেই তরংগের প্রাণকেন্দ্র বা বৃত্তবিন্দু।

তিন

প্রথম তরংগে রাজারামমোহনে শুরু, রবীন্দ্রনাথে শেষ। এই তরংগ ভারতীয় ধর্মের নৈগুণিক ভাবনা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে। বাঙালী মানসকে সংস্কার-মুক্ত এক নূতন ধর্মে, ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করতে চেয়েছে। এই ধর্মের মূল ভাবনা রয়েছে আধ্যাত্মিক পুরুষ "উপনিষদে।" উপনিষদিক ভাবনার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকবি রবীন্দ্রনাথ, ব্রাহ্মধর্মের শেষ ও মহান কবি। এই তরংগ ক্ষীণ হলেও তার রসধারা সমগ্র শিক্ষিত বাঙালীকেই রসসিক্ত করেছে।

চার

দ্বিতীয় তরংগের কেন্দ্র পুরুষ রামকৃষ্ণ। চারশতাব্দীর আধ্যাত্মিক সংস্কারের নূতন এক বৃত্ত ব্যঞ্জনা। মূলতঃ এই ধর্ম শাক্ত ধর্ম। কালীই উপাস্য, অবশ্য সকল উপাস্যতাই সেখানে বিধৃত। তাই শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনমূলে, দক্ষিণেশ্বরে যেমন পঞ্চবটী, তেমনি শিবকালী-বাসুদেবের ত্রয়ী মন্দির। শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব ত্রয়ীধর্মের সমাহার। রামকৃষ্ণকে জানতে গেলে, হিজ-মাস্টার্স-ভয়েস বিবেকানন্দ অপরিহার্য। তাই এই নূতন তরংগ যা বাঙার শুরুতে রামকৃষ্ণ, প্রভাতে বিবেকানন্দ। শাক্ততন্ত্রের মূল কথাই এখানে বিধৃত। মাতৃশক্তিকে জ্ঞান ও সাধন এই ধর্মের সর্বোত্তম অবদান। "হে ভারত ভুলিও না" প্রার্থনায় তাই অনন্যতা।

পাঁচ

তৃতীয় ধারা শ্রীঅরবিন্দ থেকে শুরু। এ-ধারার মূল সাধনা পরম-পুরুষের সাধনা। যিনি গীতোক্ত বাসুদেব—চৈতন্যময় পরমপুরুষ। নিষ্কাম কর্ম, ভক্তি-জ্ঞান-কর্ম যৌগময় জীবনই সেখানে প্রার্থনা। শ্রীঅরবিন্দের বই "সিনথিসিস অব যোগ"। শ্রীঅরবিন্দ পরবর্তী যুগে পূর্ণ-অভিযাযন-রূপান্তর (পূ-অ-র)। যোগের প্রবর্তন করে, নূতন ধারা সংযোজন করলেও, সেই পরমপুরুষের সম্মতিই তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ মূলধন। আর তাই প্রয়োজন মাতৃশক্তির কৃপা। "গীতাভাষ্যের" মাধ্যমে শ্রীঅরবিন্দ পরমপুরুষের প্রবর্তনা আসলেও, সেখানে মাতৃশক্তির বন্দনা ছিল না। যা ১৯১৮ থেকে শুরু। তাঁর "মাতৃকা" (The Mother) প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পর থেকে। ১৯২১ সালে "বাবার-মাবার পদ-বিশ্বাসের" পাকাপাকি পণ্ডিচেরী আশ্রমে এসে থাকার সাত বছর পর হতে।

১৯২৬ সালে শ্রীঅরবিন্দের অন্তর্ধানে গমন। ২৪শে নভেম্বর দিবসের সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। নলিনী কান্ত গুপ্তের কাহিনী থেকে। ... শ্রীঅরবিন্দ উচ্চাসনে উপবিষ্ট। তাঁর ডান হাত বরাভয়মুদ্রাঙ্কিত। শ্রীমা সিংহাসনে উপবিষ্ট, আর শ্রীঅরবিন্দের বাম হাত মার মাথার ওপর। এই ছবিই আসলে ঘোষণা করলো, শ্রীঅরবিন্দ-সাধনার উত্তরাধিকার কার। কর্মসূচীই বা কি? এই মুহূর্ত থেকেই "শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের সকল কর্তৃত্ব মার হাতে। ... ... সবসময় মনে কোরবে শ্রীমা তোমাকে দেখছেন, বাস্তবিকই সর্বত্রই তাঁর উপস্থিতি। পরমপুরুষের সাধনার এই স্থান থেকেই শ্রীমায়ের আবির্ভাব।

ছয়

চতুর্থ ধারা, প্রভুপাদ (অভয় পদ দে) প্রতিষ্ঠিত ইসকনের ভাগবত-ধারা। শ্রীকৃষ্ণ-রাধাই পরম উপাস্য। নামসঙ্কীর্তন উপজীব্য। ভাগবত-পাঠই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মুণ্ডিতমস্তক গেরুয়া বা চাঁপা রংয়ের পোষাকে দেশী-বিদেশী শিষ্যদের, সারা পৃথিবী জুড়ে হরিনাম গান Iskcon-কে জনপ্রিয় করে তুলেছে। পৃথিবীর যত নগর গ্রামে আমার নাম মুখরিত হবে, শ্রীচৈতন্যদেবের এই কামনা আজ বাস্তবায়িত। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণনামের ধারা সংকীর্তনলীলা স্পর্শে নূতনভাবে পল্লবিত হলো প্রভুপাদের তপস্যায় ও ভক্তিতে। আর সে-ধারা কেবল বঙ্গদেশে নয়, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই আজ প্রবহমান।

সাত

পঞ্চমধারা হোল "আনন্দধারা"। আনন্দ মূর্তিজীর (প্রভাত রঞ্জন সরকার) শৈবধারারই এক সুপ্রাচীন অবদান। পরমপুরুষের সাধনাই এখানে শৈব সাধনা। রাজযোগ এখানে উপস্থাপিত। বাঙালীচিত্ত এই সাধনার অবকাশে, একি চৈতন্য ইতিহাসের হাজার বছর আগেকার শিব-সাধনায় আবার আপন শিবত্বকে খুঁজতে চাইছে। তাই বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে সেই বুড়াশিব, আবার বাঙময় হয়ে উঠছে আনন্দ মূর্তিজীর সাধনায়। এও বাঙালীর নিজস্ব সাধনা, প্রাচীনতম ধারার সাধনা। বাঙালীর নবতম দীক্ষা।

আট

এই পঞ্চধারার মাধ্যমে, এই পঞ্চতরংগের মাধ্যমে বাঙালী চিত্ত নবভাবে আধ্যাত্মিক দীক্ষায় দীক্ষিত হতে চাইছে। আর তাইই পরিণতি তার নবতর ভাব-ভাবনা, কলা-কৃষ্টি, সাহিত্য-সংগীতে, পৃথিবীর বৃহত্তর সমাজে নব অভিযান। সামাজিক ও অর্থনৈতিক রঙ্গক্ষেত্রে বাঙালী সমাজ মনের সমুজ্জ্বল আলো থেকে আলোছায়ায় চলে গেলেও, আধ্যাত্মিক দীপ্তির ভাস্বরতায়, এই পঞ্চতরংগের মাধ্যমে পৃথিবী মঞ্চে, তার প্রতিষ্ঠা বহুস্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত।

নয়

এই পঞ্চতরংগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে শেষ দুই তরংগের কোনো পরিচয় হয় নাই। রবীন্দ্র তিরোভাবের (১৯৪১) তিন থেকে চার দশক পরে এদের আবির্ভাব।

প্রথম তরংগের অর্থাৎ "ব্রাহ্ম-ধারা" রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বয়ং ঠাকুর বাড়ীতে নিয়ে আসেন। যদিও ঠাকুর বাড়ীর কুলদেবতা ছিলেন: লক্ষ্মী জনার্দন শিলা। যে শিলাকে নীলকণ্ঠ ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটায় তত্রাসন থেকে আসার সময়ে কণ্ঠে লয় করে চলে আসেন। ঠাকুর বাড়ীর পত্তন লক্ষ্মী জনার্দন শিলার দেবোত্তর জমির উপর,—যে জমি বড়বাজারের শেঠেরা অর্পণ করেছিলেন নীলকণ্ঠ ঠাকুরকে দেবোদ্দেশে। কারণ শূদ্রের হাতে ব্রাহ্মণের দান গ্রহণ নীলকণ্ঠের সংস্কারে প্রতিবন্ধক ছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্ভারে মধুর রসের বহু প্রকাশ থাকলেও

"লক্ষ্মী-জনার্দন" প্রসঙ্গে স্থান পায়নি। বরং ব্রাহ্ম-ভজন তার সঙ্গীতে, ভাষায় প্রত্যক্ষ স্থান অধিকার করে আছে। সেই অবাধ মানস বোধলোকে কেবল তাঁর পদ ধূলল, করুণাঘন খ্রীষ্ট আশীর্বাদভরা হস্তের রূপরেখায় আমরা পাই রবীন্দ্র সাহিত্যে। সাকার স্বরূপে না পেলেও, আমরা অনুভব করি রবীন্দ্র-ব্রহ্মের উপস্থিতি, শিব আছি চন্দ্র পদের মাধ্যমে, পাই তাঁর আশীর্বাদ। যখনই আমরা মাথা নত করে দিই তাঁর চরণ ধূলায় তলে।

দ্বিতীয় ধারার প্রাণপুরুষ রামকৃষ্ণের তিরোধানের সময় (১৮৮৬) রবীন্দ্রনাথ ২৫ বছরের যুবা। রামকৃষ্ণের সাথে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার হয়েছিল কিনা জানি না, তবে রামকৃষ্ণ—কেশব সেনের সম্প্রীতি এবং রামকৃষ্ণের মহর্ষি সম্পর্কে দু-একটি অপ্রীতিকর উক্তি হয়তো সাক্ষাৎকারের প্রতিবন্ধক ছিল। তবে রবীন্দ্রনাথের সাথে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎকার হয়েছিল। বিবেকানন্দ-শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা তো ছিলেন ঠাকুরবাড়ীর কাম্য-অতিথি আবার যে নিবেদিতা ছিলেন, শ্রীঅরবিন্দের অর্থাৎ তৃতীয় ধারার খুব নিকট ব্যক্তি।

তৃতীয় স্তরংগের প্রাণপুরুষ অরবিন্দ ঘোষকে রবীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক ব্যক্তির হিসাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন : অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার। হে বন্ধু হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি তুমি। আজ ভারি পরিপূর্ণতার তবে সর্ব আয়োজন—দেবতার দীপহস্তে যে আসিল তবে সেই রুদ্রদূতে, বলো, কোন রাজা কবে পারে শান্তি দিতে। বন্ধন-পীড়ন-দুঃখ-অপমান-মাঝে হেরিয়া তোমার মূর্তি কর্ণে মোর বাজে আত্মার বন্ধনহীন আনন্দের গান।

কবিতায় শ্রীঅরবিন্দের যে ভাবী (১৯০৭ রূপের আভাষ রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন, তার পূর্ণ প্রকাশ ছিল, পঁচিশ বছর পরে পণ্ডিচেরীতে তাদের আর এক নিভৃত দৈত-সাক্ষাৎকারে। যেখানে রবীন্দ্রনাথ আশা করছেন, কবে সেই আলোর আলো বরন করে শ্রীঅরবিন্দ মানব সমাজে নেমে আসবেন। সারাজীবন রবীন্দ্রনাথ প্রথম স্তরংগের উপাসনা করেছেন। ব্রাহ্মভাবনার তিনি শ্রেষ্ঠতম কাব্য প্রকাশ। কিন্তু তাঁর সর্বশেষ কবিতাটি যা তাঁর চেতনার শেষতম প্রকাশও ঘটায় আট দিন আগে জোড়াসাঁকোর যেটি রচনা :

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনা জালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত,
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।
৩০ জুলাই, ১৯৪১]

এ কবিতায় ব্রাহ্ম ভাবনা অপেক্ষিত। প্রথমদিন শান্তি ভাবনার মাতৃকাস্তোত্র। যে মাতৃকা জগদম্বা-মহাকালী। যে মাকে রামকৃষ্ণ অহরহ দেখেছেন। বিবেকানন্দ তাঁর "হে ভারত ভুলিও না" প্রার্থনায় আবাহন জানিয়েছেন। নিবেদিতা "কালী যে মা" লেখায় উজ্জ্বল করে ধরেছেন, সেই মাতৃকার প্রকাশ কোথা থেকে এল? রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের ব্রাহ্ম-ধারা মরণের মুখোমুখি মাতৃ-ধারায় কেন রূপান্তরিত হলো? লক্ষ্মী-জনার্দনের মধুরভাব আবিষ্কৃত হলো মাতৃকায়। কি তার সূত্র? কোথায় তার মূল? এ প্রশ্ন এখন বাকিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ : এখনও প্রাসঙ্গিক

মনীন্দ্রনাথ আশ

কবি দিনেশ দাস রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বলেছেন—"তোমার পায়ের পাতা, সবখানে পাতা। কোথায় রাখিব প্রণাম।" রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক কালে মানবদরদী এক মহান কবি।

রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতা প্রসঙ্গে যদিও বলেছেন—তাঁর কবিতা বিচিত্রগামী হলেও, সর্বত্রগামী হয়নি। কথাটা সর্বাংশে সত্য নয়, কিছুটা বিনয় বশত। আগে মালিকশ্রেণী বা সাধারণ মানুষের মধ্যে শ্রমিকদের প্রতি একটা অনীহা ভাব ছিল। তাদের শ্রমের মূল্য বা মর্যাদা তারা দেতেন না। যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত হয়েছেন। অথচ সমাজের এক বিরাট ভার তারা বহন করে চলেছেন। চাকুরী-চ্যুতি বা ধর্মঘটের সময় শ্রমিকদের অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে দিন কাটে অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে। দেখা যায় সংগ্রামরত শ্রমিকদের দুঃখ-কষ্টের দিনে তিনি চুপ করে থাকতে পারেন নি। এই সময় তিনি শ্রমিকদের প্রতি তাঁর আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছেন।

ঘটনাটা হচ্ছে তখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীন। রাজত্ব শাসনের মুখ্য মন্ত্রিত্বের দায়িত্বে ছিলেন নিজামউদ্দিন। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মজুরী পুনরুদ্ধার ও মজুরী বৃদ্ধির ও অন্যান্য দাবীতে বাংলার চটকল শ্রমিকরা এক দীর্ঘস্থায়ী ব্যাপক ও ঐতিহাসিক ধর্মঘট শুরু করেন। এই সময় সমাজের সকল স্তরের মানুষ শ্রমিকদের সাহায্য ও সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন। যথা—নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, শরৎ চন্দ্র বসু, ডঃ বিধান চন্দ্র রায়, মোজাফ্ফর আহমেদ, সৌমেন ঠাকুর, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, হুমায়ুন কবির প্রমুখ। মালিকরাও তৎপর ছিলেন ধর্মঘট ভাঙ্গার নানান চক্রান্তে। শ্রমিকদের এই দুঃখ কষ্টের দিনে মানবদরদী রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই চুপ করে থাকতে পারেন নি। তাদের প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করেন, এক লিখিত বিবৃতি দিয়ে। কবির হৃদয়গ্রাহী আবেদন হচ্ছে—ফেব্রুয়ারী থেকে ধর্মঘটের ফলে শত সহস্র শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশার খবর শুনে আমি গভীর ভাবে ব্যথিত। দুর্দশা শুধু শ্রমিকদের হয়নি, তাদের পরিবারের মহিলা ও শিশুদের হয়েছে। উচ্চহার বেতন ও কাজের অধিকতর মানবিক পরিবেশের দাবী ন্যায্য ও যুক্তি সঙ্গত। পশ্চিমের প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশে সরকার জনসাধারণের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখে। নতুন সংবিধান অনুসারে গঠিত মন্ত্রীদের কাজে, হাজার হাজার শ্রমিক ও তাদের পরিবারের লোকজনদের জীবন সম্পর্কিত বিষয়টি তাঁরা বিবেচনা করবেন। তাদের প্রতি যাতে ন্যায় বিচার হয় তা কি আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না? যারা সমাজের বোঝা বয় সমাজ তাঁদের প্রতিপালন করবে এটাই মানবিকতার দাবী। ধর্মঘটকে সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য কুৎসিৎ সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিকে প্রতিটি ন্যায়পরায়ণ লোকেরই নিন্দা করা উচিত। চটকল শ্রমিক ও তাদের অসহায় পরিবার পরিজনের এই দুঃখ-কষ্টের দিনে সাহায্য করার জন্য আমি দেশবাসীর কাছে আবেদন করছি।" শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলনে শ্রমিকরাই জয়ী হয়েছিলেন।

কবি প্রণাম

শান্তিময় বিশ্বাস

যে মহাকবির কথা আজ জগতের সর্বত্র, ভারতবর্ষের সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে, যাঁর গানে, কবিতায় ও গল্পে বাংলাদেশ মাতোয়ারা, সেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে আমি ভক্তিভরে প্রণাম করি।

যে মনীষী বলেছেন—"বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি তোলা জলে আমার স্নান নয়, নদীর ঘাটের জলে আমার স্নান"—সেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রণাম করি।

যে মহাকবির মনের ভাব নদীর স্রোতের মতো চলতে চলতে মহাভাব সাগরে পড়ে অনন্ত সম্বন্ধে অনন্ত প্রশ্নের অবতারণা করে লিখেছেন—হে সমুদ্র, কিবা তব ভাষা? সমুদ্র কহিল, মোর অনন্ত জিজ্ঞাসা সেই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চরণে আমার সহস্র প্রণাম।

সন্তানকে জননীর স্নেহ প্রাণ হতে মুক্ত করে বিশ্বের কাছে পাঠাবার জন্য যিনি লিখেছেন—নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্ব দেবতার—সন্তান নহে গো মাতঃ সম্পত্তি তোমার।" সেই কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথের চরণে আমি প্রণতি জানাই।

প্রকৃতির রাজ্যে কত মহাভাবময় দৃশ্য, গন্ধ, গানে অন্তরে মহাভাব সৃষ্টি করে মনকে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়, সে সম্বন্ধে যিনি লিখেছেন—"যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে, তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।" সেই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের চরণে আমার অজস্র প্রণাম।

যাঁর মন সদা শিশুর মনের মত, যিনি শিশুর মনের দুঃখ সর্বাঙ্গ করনে উপলব্ধি করে—পুরবিহার, সে কেন যা এমন বেদী করেছি চুরমার যিনি যার দ্বারা শিশুমনের দুঃখ সমবেদনরূপে প্রকাশ করেছেন, সেই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে আমি জানাই প্রণাম।

ঈশ্বর সংসারেই আছেন। সংসারত্যাগী সংসার ছেড়ে যাচ্ছেন। সংসারের ভগবান বাধা দিচ্ছেন। কোন বাধা না মেনে তিনি চলে গেলেন। তাই সংসারের ভগবানের মনে নিদারুণ বেদনা। সেই বেদনা ব্যক্ত করার জন্য যিনি লিখেছেন,—"আমারে বাঁধিয়া তুমি চলিলে কোথায়।" সেই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রণাম করি।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি চলছে, চলবে। সেটা যে কত দূর চলবে, তা বোঝাবার জন্য যিনি লিখেন,—"ক্ষুদ্র শক্তি করিব তুচ্ছ, শক্তির নিয়ে চড়িব উচ্চে ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ, বাহু বাড়াইব তপনে।"—সেই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রণাম করি।

মানব জীবন দুঃখময়। কিন্তু সেই দুঃখের মাঝে আছেন ভগবান। সে কথা বোঝাতে গিয়ে যিনি লিখেছেন,—"দুঃখের বেশে এসেছিলে বলে তোমারে নাহি ডরিব হে। যেখানে ব্যথা, তোমারে সেথা, নিবিড় করিয়া ধরিব হে।" সেই কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে আমি প্রণাম করি।

মানুষ যাকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে, সে হল মরণ। সেই মরণকে যিনি পরম প্রেয় জ্ঞান করে লিখেছেন,—"মরণরে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।" সেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চরণে জানাই প্রণতি।

অনন্ত ভাবের ভাবী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে অনন্ত কাল ধরে প্রণাম করেও ভাষা মেটে না। আজ তিনি অনন্ত ঈশ্বরের সঙ্গে মিশে আছেন। তাই আজ তিনি অনন্ত ভগবান। অতএব গীতার মন্ত্র :

"নমো নমস্তেঽস্তু সহস্র কৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে।"

উচ্চারণ করে এবং আবার তাঁকে প্রণাম করে আমি আমার কবি-প্রণাম শেষ করছি।

বেলাভূমে দাঁড়িয়ে কেন

শ্রীবুদ্ধী

মান-অপমানে এখন ভাবিনা কিছুই
সম্মানের কাঙাল নই প্রতি পদক্ষেপে
কা'র কথায় কী আসে-যায়!
ভালো-মন্দের হিসাবে যেতে চায়না মন
হৃদয়ে ছন্দোবদ্ধ তরঙ্গসুন্দর প্রণয়-সমুদ্র,
বেলাভূমে দাঁড়িয়ে কেন?
এসো। অবগাহনে নিয়ে যাও নীলিমার অনুরাগ,
ভালোবাসা ছাড়া কিছু নেই এ-ভাণ্ডারে।

মান-অপমান সমান এখন
গঙ্গা আর নর্দমার জল
অভেদ ভেবেই পান করি আমার তৃষ্ণায়।

বেলাভূমে দাঁড়িয়ে কেন?
এসো। পূর্ণ স্নানের মধ্য দিয়ে
বিনিময় হোক হৃদয়ের আকাশ আকাশ অনুভব।

□

কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ

অরুণ কুমার দে

বিশ্বভূতে আজ এসেছে জনজাগরণের দিন। দেশের বেশীর ভাগ লোক যারা চাষাভূষা, কুলি মজুর অর্থাৎ দিন এনে দিন খাওয়ার দল—এদের সকলের সঙ্গে আজকের দিনের মহাকবি রবীন্দ্রনাথের মনের যোগ চিরকালের। ভাবে, কাজে, কথায় ও আন্তরিকতায়।

রবীন্দ্রনাথ জমিদার, কৃষকরা তাঁর প্রজা, সুতরাং তাদের সঙ্গে স্বভাবতই তাঁর যোগ থাকবার কথা। জনগণের সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক যোগ জমিদার হিসাবেই। কিন্তু খাজনা আদায় এবং বিষয় ব্যবস্থায় তাঁকে তাঁর মন জমিদার সুলভ মানসম্ভ্রমের বেড়া পেরিয়ে যেত সাধারণের কাছে। তারা জানতও না কখন কোন ঘাটে-বাটে, অলিতে গলিতে তাঁর সেই মনের আনাগোনা। ছিন্নপত্র, 'সোনার তরী' 'চিত্রা' 'চৈতালী' পাঠের পর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

শুধু ভাবভূমিতেই তিনি কাছের মানুষ হয়ে থাকেন নি। রাশিয়ার জনগণও তাঁকে কাছের মানুষ করে নিয়েছেন। এবং শুরু করেছেন তাঁদের নবজীবন গড়ার কাজ। পল্লীগ্রামে ঘুরে—ঘুরে তাঁদের সুসংবাদ জীবনকে তিনি জানালেন অভিনন্দন, এবং তারই প্রকাশ 'রাশিয়ার চিঠি'তে। সে রাশিয়াই হোক আর বাঙলার কোন গ্রামই হোক, সর্বত্রই তিনি কাছের মানুষ। আর তাঁর এই যোগ ঘুভোরের সঙ্গে পেরেকের যোগ নয়, ও নিতান্তই মনের যোগ।

'জীবনে জীবন যোগ করা' বলতে যেভাবে যতটা কাছে থাকার কথা তাঁর এই যাত্রাও, ততটা না ঘটলেও দূরে থাকতে জনগণের কথা তিনি বহুখানি করেছেন। তাঁর সময়শ্রেণীর মধ্যে তা একান্ত দুর্লভ। সকলের শিক্ষা প্রসারের জন্য গ্রামে বিদ্যালয় ও বক্তৃতার ব্যবস্থা 'লোক-শিক্ষা'র ব্যবস্থা আর্থিক সংকট কাটাতে কৃষি, কুটির-শিল্প ও 'সমবায় ধনভাণ্ডার' প্রবর্তন। স্বাস্থ্যের মানকে ঠিক রাখতে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ও বিনোদনকে সংবদ্ধ করার জন্য খেলাধূলার মাধ্যমে 'ব্রতীদল' গঠন, প্রভৃতি নানা কাজের উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি জনগণকে নিজের কাছের মানুষ ভেবেই।

আমরা মহাত্মাজীর যে আইন অমান্যের কথা জানি তার বীজ পুতেছিলেন কবি নিজের হাতে; তাঁর নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে একটু যোগ থাকলেই সে কথা প্রমাণিত হয়, প্রায়শ্চিত্তে ও 'মুক্তধারা'র প্রজাদের উত্তেজিত ও প্রতিকারে খাজনা বন্ধ করে সংগ্রামে নামিয়ে কবি যে তাদেরই পাশে আছেন তা বোঝাতে কুণ্ঠিত হন নি। তাই তিনি বিনা দ্বিধায় গোরাকেও নামিয়েছেন সকলের সঙ্গে সংগ্রামে। আর এই সংগ্রামে যে ওরাই টিকে থাকবে, তার আভাসও কবি দিয়েছেন, কারণ তিনি জানেন, বিশ্বের সব কিছু খেয়ে ফেলেও ওদের কাজকে থামানো যাবে না:

"শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-পরে ওরা কাজ করে।"

কালের যাত্রাতেও কবি সাধারণ মানুষ শূদ্রদের জয়কেই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। তাই তিনি বলেছেন—'ওরাই যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ·····এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদের, নয়ে সমান হয়ে।' কালের যাত্রায় বিশ্ব মানবের উদ্দেশে কবির বিশেষ নির্দেশ অন্তরের ভালের ওপর বিশ্বাস রাখার জন্য।

বিদ্যাকে আশ্রয় করে জীবন গড়ার কাজ নিয়েই তো কবি এসেছিলেন সকলের মধ্যে। তাঁর অভিনিবেশে দীক্ষিত এক একটি ব্যক্তিজীবনে দেশের কাজে উপহার দেওয়াই ছিল তাঁর সংকল্প। তিনি ভেবেছিলেন :

'এইসব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা ; এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।'

এসব কথায় স্পষ্টই বোঝা যায় যে কবি ছিলেন আমাদের সকলেরই একান্ত কাছের মানুষ।

রবীন্দ্রনাথ

আনন্দ বাগচী

কই সেই বাঁশিতো আর বাজে না!
শতবর্ষ পরে সময়ের তরণী বেয়ে
বিংশ শতক বেয়ে যায়।
মৃত নক্ষত্রলোকের আলোর,
কিছু নিভে যায়।
অশ্রু ; দুঃখ-শোক, আর্তনাদ—
এক হয়ে, কেবলি মন্দ ধূসর বাড়ায়।
এইভাবে বেলা শেষ হয়ে আসে—
খেলার ছলে রেকাবে
অর্ঘ্য সাজাই বারে বার।
জ্বালি ধূপ ও প্রদীপ—
জ্ঞানদাপী তপে,
মগ্ন হয়ে যাই অর্চনাতে।
উত্তরণের ভার সমর নিয়ে যায় দুপিদারে।
হে কবি—
হে কুলশ্রেষ্ঠ কবিগুরু—
করি স্মরণ তোমায়।
কারো হৃদয়ে তুমি আজো,
আশ্চর্যভাবে বেঁচে।
নিভাজ বইয়ের পাতায়-পাতায়
বন্ধ করে রাখি—
কঠিন সময়ের ঘাই লেগে
পাষাণ হয়ে যায় মন।
তবু জানি, কিছু মৃত নক্ষত্র এখনও
আলোর শুভবার্তা পাঠায়—
তাইতো পাল্লা হয় সবুজ
প্রগাঢ় ভালবাসায়।
দুনি হয়ে উঠে লাল,
তোমায় ভুলতে চাওয়ার বেদনায়।

চিরকালের চিরসুন্দর রবীন্দ্রনাথ

রাজীব কুমার মণ্ডল

নীল আকাশের বিধাতা মেঘ ও রৌদ্রের খেলা খেলতে খেলতে আপন খেয়ালে বাংলা মায়ের বুকে সৃষ্টি করলেন এক বিচিত্র প্রাণস্পন্দন, পরবর্তীকালে যা সমগ্র বিশ্বে এক প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছিল। বিধাতাসৃষ্ট এই প্রতীকের মানবীয় রূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের দৈব প্রতিভাত। মহাসমুদ্রের বিশালতা ও গভীরতা সমৃদ্ধ রবীন্দ্র সাহিত্যে তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঙ্গে এত সর্বতোমুখী হয়ে দেখা দিয়েছে যে পৃথিবীর ইতিহাসে তা নিতান্তই বিরল। সর্বতোমুখী প্রতিভার উৎস রবীন্দ্রনাথ নবরসের মত অজস্র ধারায়—কাব্যে, উপন্যাসে, সঙ্গীতে, নাটকে, গল্পে, গানায়, প্রবন্ধে, কথিকায়, ধর্মতত্ত্বে, দর্শনে চিত্রে—এককথায় বাংলা সাহিত্যের সকল শাখাকে নবজীবন ও নবচেতনায় প্লাবিত করেছেন। একথা সাহিত্য-রসিক ব্যক্তি মাত্রেই এক বাক্যে স্বীকার করবেন যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্ব দান করে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের পুনর্জন্ম দিয়েছেন। প্রায় অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল ধরে বাংলা ভাষার অমূল্য রত্নালংকার ও অপূর্ব রূপ রাগে শোভিত সুন্দর করে তুলে আজ বাংলা সাহিত্যকে, বিশ্বসাহিত্যের আসরে এক বিশেষ স্থানে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁর রচনা শুধু মাত্র বাংলা সাহিত্যের নয়। সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যেরও চিরন্তন সামগ্রী রূপে সমাদৃত হয়েছে। তাই তিনি "বিশ্বকবি"।

রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের অন্যতম নন—তিনি একজন গভীর দার্শনিক, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ববিদ্, সুকুমার কলাবিলাসিক শিল্পীও বটে। তিনি শুধু প্রতিভাশালী নাট্যকারই নন—কলা-কুশল নটও। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত রচয়িতাই নন—উচ্চ শ্রেণীর গায়কও, তিনি শুধু সুরবিদ নন—সুরস্রষ্টাও। দেবী সরস্বতীর অর্চনায় তিনি কেবল মাত্র 'বাণীর' অর্ঘ্য দিয়েই ক্ষান্ত হন নি—'বর্ণের' অঞ্জলিও দিয়েছেন। তাঁর অসামান্য প্রতিভা শুধু সাহিত্যকে নবীনের পথে নিয়ে গিয়ে ধন্য করেনি, চিত্র শিল্পকেও নতুন পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ধন্য করেছে। রবীন্দ্রনাথ চিরসুন্দর মানবপুত্র, তাঁর সবই সুন্দর। তাঁর অভিজ্ঞতার প্রতীতার সকল সৃষ্টিই অনুপম সুন্দর। তিনি রূপ-লক্ষ্মীর একনিষ্ঠ পূজারী, সৌন্দর্যকলায় তাঁর অসাধারণ অনুরাগ। এই অসামান্য শিল্পী তাঁর স্বদেশ ও বিশ্বজগৎকে যা দান করেছেন, তার পরিমাপ ও মূল্য নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়।

পৃথিবীর সব দেশেই, সব ভাষাতেই প্রতিভাশালী কবিদের রচনা পাওয়া যায়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে সর্বত্র যেরকম আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তা অবলম্বনীয় ও অবর্ণনীয়। এই কবির রচনায় এমন কিছু আকর্ষণীয় বিশেষত্ব আছে যাতে দেশ-জাতি নির্বিশেষে সকল মানুষই আকৃষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায় মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রচণ্ড খরতাপ নেই, আছে কৌমুদির স্নিগ্ধ-শান্ত কোমল রহস্যময় আলোক। পথশ্রান্ত, রৌদ্রক্লান্ত পথিক যেমন মহীরুহের শীতল ছায়াকে আশ্রয় করে শীতল হয়, তেমনই সংসারক্লিষ্ট ব্যক্তি এই কবীর বাণীতে সেইরকম শান্তি লাভ করে থাকে। মানব-হৃদয়ের অন্তরস্পর্শী বেদনা এই কবির ছন্দে ধ্বনিত হয়েছে, প্রাণের মূক ব্যথা মর্মস্পর্শী ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে। যা আমাদের মনে আসে অথচ মুখে আসে না, আমাদের হৃদয় যে তৃপ্তি পেতে চায় অথচ পায় না, তাই যেন তাঁর রচনায় মধুময় ছন্দে গাঁথা রয়েছে। মানব-হৃদয়ের

গোপন অন্তস্থল থেকে যে আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে, ভাষাতীত যে সকল ভাব অমরীরী ছায়ার মত মনের মধ্যে সঞ্চরণ করে, কবির যাদুকাঠির ছোঁয়ায় তারা আশ্রয় জীবন্ত মূর্তি ধারণ করে। কবিতায় ও গানে তিনি যেভাবে ঈশ্বরের সংগে মানুষের সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন তা অকল্পনীয়। আমাদের দেশে বাউল গানেও ভগবৎ প্রেম বড় মধুর, প্রত্যক্ষ ও সহজ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে, নানাদিক থেকে এই প্রেম ব্যক্ত করেছেন। এই প্রেম এত গভীর যে সাধারণতঃ অতলস্পর্শ বলে মনে হয়। এই কারণে কবির ভাষা সহজ ও সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু স্থানে তার ভাব গ্রহণ করা খুব কঠিন। ভাবুক না হলে অনেক সময় কবির মর্মকথা বোঝা যায় না। পরমার্থতত্ত্ব তো কেবলমাত্র ধ্যান-ধারনার সামগ্রী নয়, তা প্রত্যক্ষ অনুভবের বস্তু। এই কবির সঙ্গীতে তা স্পষ্ট বোঝা যায়। বিশ্বসাহিত্যে আজ পর্যন্ত যত প্রকার ভাবস্রোত প্রবাহিত হয়েছে, তার সমস্তকে রবীন্দ্রনাথ এক সমন্বয়মূলক একীকরণ সূত্রে গ্রথিত করে আপনার বর্ণ বীণায় তন্ত্রী যোজনা করেছেন। তাই একই বীণায় সহস্র ধ্বনি ঝঙ্কৃত করতে পেরেছেন রবীন্দ্রনাথের মত এক দেব-দুর্লভ প্রতিভা। কিন্তু এত সকল বৈচিত্র্যের মধ্যেও তিনি ঐক্যটিকে হারিয়ে ফেলেন নি। অদ্বৈতের মধ্যে তিনি সকল বৈচিত্র্যের সমাধান ঘটিয়েছেন।

কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রধান রস কাব্যরস—যা 'লিরিক' কবিতার জীবন। রবীন্দ্রনাথের কথা সাহিত্যেও তাঁর জীবনের এই প্রধান রসকে কেন্দ্র করে তারই আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে। তাঁর কথাসাহিত্য যেন তাঁর জীবনের এই রসসাগরের প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ। সাগরের প্রবালের মত তাঁর উপন্যাসের কাহিনীগুলি এই রসসাগরে অবলম্বন করে ক্রমে একটি সূক্ষ্ম প্রবাল বেষ্টনীর মত তার একটি ক্ষুদ্র খণ্ডকে শুধু ধারণ করে রেখেছে। কথা বা গল্প সাহিত্যও কাব্যের মত রসরচনা। সেই গল্প সাহিত্যই সার্থক যাতে রস একটা পরিপূর্ণ মূর্তি গ্রহণ করেছে। গীতরসের যেমন দুটি উৎস—কথা ও সুর তেমনি কথা সাহিত্যের রসেরও দুটি উপকরণ—উপাখ্যান ও ভাব। রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের উপন্যাস, ছোট গল্প, প্রবন্ধ প্রতিটি রচনাতেই ভাবরসের যে সব সূক্ষ্ম অবসর আছে, সেগুলি আশ্রয় করে তিনি তাঁর রচনাকে অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছেন। প্রায় প্রতিটি গল্প রচনাই তাঁর এইসব সূক্ষ্ম ভাবের অভিব্যক্তি ও পরিণতির ইতিহাস—কোমল তুলিকার সূক্ষ্মতম রেখা ও বিন্দুপাতে আঁকা এক বিচিত্র চিত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম শুধুমাত্র কবি হিসেবে জগতের সর্বত্র পরিচিত, এমন নয়। তাঁর বিরচিত কাব্য ও অন্যান্য গ্রন্থসমূহ পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশ তিনি ভ্রমণ করেছেন, সে সকল দেশের সকল জাতির লক্ষ লক্ষ লোক তাঁকে দর্শন করেছে, তাঁর বাণী স্বকর্ণে শুনেছে। সকল দেশের ঘরে ঘরে তাঁর প্রতিকৃতি রক্ষিত আছে, সর্বত্রই তিনি অশেষ সম্মান লাভ করেছেন। তাঁর সমকালীন ভারতবর্ষ ছিল পরাধীন দেশ স্বাধীন জাতির সভায় ভারতবাসীর স্থান ছিল না, কিন্তু এই বাঙালী কবি নিজের জীবদ্দশায় যেরূপ জগদ্ব্যাপী সম্মান লাভ করেছেন, তা সম্ভবতঃ বিশ্বের আর কোন কবি পাননি। রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র "নোবেল পুরস্কার (১৯১৩)" পেয়েছিলেন বলেই যে তাঁর এইরকম সার্বজনীন প্রতিষ্ঠা হয়েছে তা নয়। প্রতি বছর কোন না কোন লেখক এই পুরস্কার পেয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউই এরকম সকল জাতির হৃদয়ে উচ্চাসন লাভ করেন নি। নোবেল পুরস্কার পেয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রথম পাশ্চাত্য জগতে পরিচিত হয়েছিলেন এই মাত্র। তারপর সকল জাতিতে, সকল ভাষায় তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। অনুবাদে হয়তো তাঁর কাব্যের ও কবিতার অন্তরতমা মোহিনী শক্তি পরিপূর্ণভাবে রক্ষিত হয়নি,

শব্দের লালিত্য ছন্দের মাধুর্য্য ভাষার কমনীয় সৌষ্ঠব অন্য কোন ভাষায় রক্ষা করা যায় না, এক-মাত্র ভাব-অনুবাদ করা যায়। সেই কারণে পাঠকেরা অন্য ভাষায় কবির মর্মকথা গ্রহণ করতে সক্ষম হন। মাত্র তবুও তাঁর সাহিত্যের অনুবাদ পড়েই সকল জাতির সকল পাঠকেরা বিমুগ্ধ হয়ে গেছেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার জগৎ যেমন মুগ্ধ হয়েছে, তাঁর শান্ত, সৌম্য, সুন্দর, অবিস্মরণীয় মূর্তি দেখেও সেই রকমই তৃপ্তিলাভ করেছে। বিধাতা তাঁর অক্ষয় ভাণ্ডার থেকে এই কবিকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করেছেন। এই মহাকবি কেবল ছন্দেবন্ধে কুশলী নন, দেবী সরস্বতী তাঁর কণ্ঠে সঙ্গীতের আধার স্থাপন করেছেন। পীযূষকণ্ঠ, প্রিয়দর্শন কবি তাঁর প্রতিভার মোহিনী শক্তিকে সর্বত্রই সমাদৃত হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের দৈবপ্রতিভা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে একবিংশশতাব্দী কালের মধ্যে এক সহস্র বর্ষের সমৃদ্ধি দান করেছে। শুধু তাই নয় তৎকালীন বাংলা সাহিত্য এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব কিভাবে সংস্কৃত সাহিত্য ও বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর সাহিত্যকে অনির্বচনীয়তা, বিচিত্রতা ও উৎকর্ষ প্রদান করল—তা সত্যিই অকল্পনীয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, তিনি যেন কোন এক গ্রহান্তরের জ্ঞানপুরুষ অনিবার্য কারণে আপন কক্ষচ্যুত হয়ে এই পৃথিবীতে এসে পড়েছিলেন। মানুষের জীবনকে তিনি এক নতুন রূপে রূপায়িত করেছেন, তার সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, এবং আনন্দ বেদনাকে তিনি দিয়েছেন ভাষা। মানুষকে ও মনুষ্যত্বকে মহিমময় করে তোলার আদর্শ-কেই তিনি বড় করে দেখেছিলেন। বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি নয়—অনাসক্ত বন্ধন মাঝেই মহানন্দময় মুক্তি : ঘরেই জীবন, পরাজয়ে নয়—মানবধর্মের এই জয়গানই তাঁর জীবন ও কাব্যে মূর্তায়িত। প্রচলিত আচার ও মতানুগতিক বিধিনিষেধ—যা মানুষকে চিরদিন পঙ্গু করে রাখে, তার বিরুদ্ধে উড়িয়েছিলেন বিদ্রোহের নিশান। জগতের নিপীড়িত জনগণকে তিনি আহ্বান করেছিলেন শৃঙ্খলিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে। —বাংলা সাহিত্যে এই গৌরব-রবি যে দীপ্ত-আলোকে উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন, সে আলোক এখনও অনির্বাণ রয়েছে। সুরের বিচিত্র বর্ণবাস-জালে, কল্পনার সুদূরবিস্তীর্ণ দিক্ চক্রবাল রেখায় তাকে অক্ষুণ্ণ চিরসুন্দর করে তুলতে, অতৃপ্ত-তৃষ্ণার চির-দিনের তীব্র আকর্ষণের মতো বাঁচিয়ে রেখে সাহিত্যকে নিত্য ও সত্য বস্তু করে তোলার যে দিব্যপথের সন্ধান তিনি দিয়েছেন—বাংলা সাহিত্যে কেন, বিশ্ব সাহিত্যেও তা চিরদিনের জন্য তাঁর অতুলনীয় দুর্লভ দান বলে গণ্য হবে। বিশ্বসাহিত্যের আকাশে "আজি হতে শতবর্ষ পরে"ও আপনার দিব্য আলোকচ্ছটায়, তাঁর দীপ্তিতে নতুন সূর্যের মতো বিরাজ করবেন মানবধর্মের একনিষ্ঠ উপাসক—বিশ্বমানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথ।

কালান্তর ও রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনীতিতে সার্বভৌম মানবচিন্তা

শক্তিপ্রসাদ রায়শর্মা

জাতীয়তাবাদের পাশ্চাত্যপদ্ধতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিলো নির্মম ঘৃণা। তিনি বুঝেছিলেন যে, উগ্র জাতীয়তাবাদ আনে অনর্থ অনাস্থি আর রক্তপাত। কবি দেখেছেন, স্যানক্যালিজমের বীভৎস মূর্তি, উপলব্ধি করেছেন, জার্মান নাৎসীবাদের নির্মমতা এবং প্রত্যক্ষ করেছেন, জাতীয়তাবাদী ইংরেজের অত্যাচারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন চীনের দুরবস্থা। এই সব অভিজ্ঞতার ভিত্তি আছেনই যে কবিকে জাতীয়তাবাদের প্রতি অনাসক্ত করেছে তা নয়। উপনিষদে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ জীবনের কোনো পর্বেই অধ্যাত্মচিন্তা থেকে মুক্ত ছিলেন না। অধ্যাত্মচিন্তাই তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী অগ্রগতির উৎস। বিশ্বমানব পরিক্রমায় প্রবৃদ্ধ আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রনাথের সাম্প্রদায়িকতামুক্ত রাষ্ট্রচিন্তা আর অধ্যাত্মচিন্তা একাকার হয়ে অবস্থান করছে তাঁর কালান্তর গ্রন্থে। যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে রসবোধের সমন্বয় সাধনের পদ্ধতিতেই তিনি সার্বভৌম মানবচিন্তাকে বাণীরূপ দিয়েছেন 'কালান্তর' গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশকে পরিব্যাপ্ত দেখেছিলেন সারা পৃথিবীর ভৌগোলিক রেখায়।

'কালান্তর' গ্রন্থের পাঠ শেষ করলে একথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, অধ্যাত্মচিন্তা থেকেই তাঁর মনে এসেছে এক বিশ্বানুভূতির আদর্শ। কোনো বিশেষ দেশের প্রতি অনুরাগের কাছে এই বিশ্বানুভূতিকে খাটো করতে তিনি প্রস্তুত নন। এই বিশ্বানুভূতির আদর্শকে মাথায় ক'রে কবি রাজনৈতিক জীবনের পথেও নামবার সাহস রেখেছিলেন। 'নীতিবন্ধন অসহিষ্ণু অর্থ-সাহসিকতার ঔদ্ধত্যকে একদিন ঈশ্বরত্বের লক্ষণ ব'লে মানুষ স্বীকার করেছে'—'কালান্তর' প্রবন্ধের এই উক্তি কবির অধ্যাত্মচিন্তারই পরিচয়বাহী। কোনো কিছুকে খণ্ড হিসেবে তিনি দেখতে চাননি, সামগ্রিক সত্তার দিকেই তাঁর লক্ষ্য।

কবির বিশ্বাস, মানসিক বৈষম্যই অসহিষ্ণুতা, ঔদ্ধত্য আর উৎকট হিংসার জন্মদাত্রী। পৃথিবীতে বৈষম্য কখনো এসেছে জাতিবিদ্বেষের রক্তাক্ত পথ বেয়ে, কখনো এসেছে ধর্মগত গোঁড়ামির অন্ধকার গলি দিয়ে এবং কখনো অর্থনৈতিক ব্যবধানের প্রাচীর ধরে। পৃথিবীর ইতিহাসের নজির দেখে কবি ধরে নিয়েছেন যে, মানসিক বৈষম্যকে বাঁচিয়ে রাখলে মানুষ কোনোক্ষেত্রেই মিলনের সেতু রচনা করতে পারবে না।

কবির স্থির বিশ্বাস, বুদ্ধি নয়, বিরোধ নয়, নিছক অনুভূতিই মানুষকে আধ্যাত্মিকতার স্তরে পৌঁছে দিতে পারে। তাই 'কালান্তর' প্রবন্ধে 'মানবিকতা' শব্দটির বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ এনেছেন তিনি। বৃহত্তম মানবসমাজের মহত্তম কল্যাণের জন্যে কবি গভীরতম অনুভূতির পথ ধরে চলেছিলেন ব'লেই তাঁর রাজনৈতিক জীবন কোনো কোনো উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকের বাঁকা কটাক্ষে বিদ্ধ হয়েছিলো। কিন্তু প্রসারিত দৃষ্টিতে সমগ্র মানব সমাজের মঙ্গলচিন্তা করে দেখলে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তা, সমাজচিন্তা, ও ধর্মচিন্তার মূলে যে সার্বভৌম মানবচিন্তার দৃঢ় ভিত্তি আছে তাকে মাথা হেঁট ক'রে স্বীকৃতি জানাতে হয়।

'কালান্তর' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতিচিন্তা, রাজনৈতিক চিন্তা, সমাজচিন্তা, স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বমানবতা বোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর বিশদ ঐতিহাসিক দৃষ্টি। উনিশ শতকের শিক্ষিত সমাজে একাধারে ছিলো ইংরেজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিরূপতার মনোভাব। এই দ্বন্দ্বাত্মকতাকে কবি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ঐতিহাসিক দৃষ্টির তীক্ষ্ণতায়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় কবির নিজের উক্তি—'আমরা সেদিন ভারতে স্বাধীনতার প্রত্যাশা মনে স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করেছি। সেই প্রত্যাশার মধ্যে একদিকে যেমন ছিলো ইংরেজদের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর-একদিকে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা।' ইংরেজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধারণা একমুখী নয়। মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের সঙ্গে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের যে পার্থক্য কবি লক্ষ্য করেছেন তার নগ্ন চেহারা কবি নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কবি দেখেছেন, খ্রীষ্টের বাণীকে ব্যর্থ করে বস্তুগর্ব, সাম্রাজ্যলোভী ইউরোপ এক নির্লজ্জ-রূপে প্রকাশিত। তাঁর দৃষ্টি শুধু ইউরোপের দিকেই নিবদ্ধ ছিলো না, স্বদেশী আন্দোলনেরও চুল-চেরা বিচার করেছেন তিনি। 'আমরা যে পরিমাণে উত্তেজিত হইয়াছিলাম তদনুযায়ী জাতীয় চরিত্রকে স্থৈর্য করিতে পারি নাই'—কবির এই উক্তির সত্যতা আজো আমরা অনুভব করতে পারি।

'কালান্তর' গ্রন্থের 'কালান্তর' প্রবন্ধে ইংরেজের সঙ্গে মুসলমানের তুলনামূলক আলোচনায় অবতীর্ণ হয়ে কবি আমাদের সতর্ক করার কথা ভেবেছেন। 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা'—উক্তিটি কবির কাছে মুসলমান সম্রাটদের অস্বাভাবিক মূঢ়তা আর উৎকট ঔদ্ধত্যের পরিচয়বাহী। সমগ্র ভারতীয় জাতির মহামূল্যবান অধিকার থেকে আলোর রাজ্যে অভ্যুদয়ের পশ্চাতে ইংরেজের যে সক্রিয় সহযোগিতা ছিলো তাকে কবি মুক্ত কণ্ঠেই স্বীকৃতি জানিয়েছেন—'ইংরেজ সাম্রাজ্য মোগল-সাম্রাজ্যের চেয়েও প্রবল ও ব্যাপক সন্দেহ নেই : কিন্তু এমন কথা কোনো মূঢ়ের মুখ দিয়েও বেরোতে পারে না যে, উইলিঙ্ডনো বা জগদীশ্বরো বা।' তবে ইংরেজের মধ্যেও যে পরস্বাপহারিতার চরিত্রের অনুপস্থিতি আছে তার প্রতিও পক্ষপাতে কবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, যে ইংরেজ ভারতবর্ষে নতুন যুগের বার্তা ঘোষণা করেছে সেই ইংরেজই আইন এবং শৃঙ্খলার কবলের মধ্যে এদেশের অগ্রগতিকে করেছে ব্যাহত। ইংরেজ রাজত্বে যেখানে শাসনযন্ত্রের নিষ্ঠুরতায় মানবিকতার অভাববোধ প্রকট হয়ে উঠেছে সেখানে ধ্বনিত হয়েছে কবিকণ্ঠের নির্ভয় ধিক্কার।

রবীন্দ্রনাথ যে শুধু কল্পনার লীলাবিলাসী কবিই ছিলেন না তার প্রমাণ আছে 'লোকহিত' প্রবন্ধে সমাজ জীবনের সুস্পষ্ট আলোচনায়। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, লোকহিতের অধিকারী তাঁরাই যাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত লোকপ্রীতিকে হৃদয়ে স্থান দেন। অহংকারে স্ফীত হয়ে লোকহিত করতে যাওয়া নিরর্থক। কবি গণসংযোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। আর গণসংযোগকে তিনি প্রীতির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কবির 'ঐকতান' কবিতা এবং 'রক্তকরবী' নাটকের কথা স্মরণীয়। 'সম্মানের চিরনির্বাসনে' কবি থাকতে চাননি। মাটির কাছাকাছি কবির দর্শনই তাঁর কাম্য। শুধু গুটি দিয়ে চোখ ভোলানোর তিনি পক্ষপাতী নন। বক্তৃতানির্ভর মুখোশধারী দেশনেতা, গণসংযোগমুক্ত রাজা এবং শুভবুদ্ধিহীন শিক্ষাবিদ্ কবির সমর্থন বঞ্চিত।

সমাজের অপমান কী নিদারুণভাবে মানুষের হৃদয়ে এসে বাজে তা কবি সহজ সামুজ্য প্রয়োগের দ্বারা স্পষ্ট করে তুলেছেন—'কুস্তির সময়ে কুস্তিগিরদের গায়ে পরস্পরের পা ঠেকে তাহার হিসাব কেহ জমাইয়া রাখেনা। কিন্তু সামাজিকতার স্থলে কথায় কথায় কাহারো গায়ে পা ঠেকাইতে থাকিলে তাহা ভোলা শক্ত হয়, 'লোকহিত' প্রবন্ধে কবির সাম্প্রদায়িকতামুক্ত উদার

রাষ্ট্রচিন্তা এবং আধ্যাত্মিক চেতনার উদ্ভাসিত মানবিকতার পরিচয়বাহী। বলা বাহুল্য দুটি একটি নাইট স্কুল খোলার কবির আস্থা নেই, এক নায়কের কুক্ষিগত ক্ষমতায় কবির শ্রদ্ধা নেই, শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোনো ভেদরেখা টানতে কবির ঘোরতর আপত্তি।

বঙ্গবিচ্ছেদের বেদনায় হিন্দুদের সঙ্গে বাংলার মুসলমান সমাজ যে এক হতে পারেনি তার কারণ নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথ নিরপেক্ষ জীবন দৃষ্টি, উদার রাজনৈতিক চিন্তা এবং গভীর সহানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন। 'বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ, তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনোদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই'—রবীন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা এই বাস্তব সত্যটি আমাদের কাছে স্পষ্ট ক'রে তোলে যে, ধর্মীয় সংকীর্ণতা এবং অহংকারের বশে হিন্দুরা চিরকাল মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রেখেছে। আর এই জন্যেই বিপদের দিনে হিন্দুরা মিষ্টেটারী ভঙ্গিতে মুসলমানদের কাছে ডাকলো তখন মুসলমানরা আন্তরিকভাবে সে ডাকে সাড়া দিতে পারলো না। 'ঘরেবাইরে', 'গোরা' প্রভৃতি উপন্যাসে এবং নানা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ধর্মীয় ও জাতিগত সংকীর্ণতা বা হিন্দুমুসলমান সমস্যা নিয়ে যে সব আলোচনা করেছেন তাতে প্রকাশ পায় অপমানিত মানুষের প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি এবং নির্ভয় সত্যকথা উচ্চারণ করার দুঃসাহস। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে কবির 'দুর্ভাগা দেশ' কবিতাটির কথা।

১৩২১ সাল থেকে ১৩৪৮ সাল পর্যন্ত লিখিত রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলোই 'কালান্তর' গ্রন্থে সংকলিত। কবির চোখের সামনে জিন্না সাহেব কংগ্রেসকে বর্জন করেছেন, সাম্প্রদায়িক সমস্যার ভারতব্যাপী দেখা দিয়েছে অনৈক্যের ফাটল। গান্ধীজি বিপর্যস্ত, রবীন্দ্রনাথ বিচলিত। সেই হিন্দু মুসলমান সমস্যার এক নিদারুন ছায়াপাত ঘটেছে কালান্তর গ্রন্থে। হিন্দু মুসলমান সমস্যা এবং তৃতীয় পক্ষ ইংরেজের ভূমিকা বিশ্লেষণে কবি অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। কবি উপলব্ধি করেছেন যে, ধর্মের পরিমায় উদ্ভাসিত ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের মর্মমূলে আছে ধর্ম-বিদ্বেষের মর্মবিদারী বহ্নি। আর দেশবাসীকে আত্মদর্শনে সাহায্য করার জন্যে তিনি তুলে ধরলেন এক বাস্তব দৃষ্টান্ত—'নিজে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিব অথচ অন্যে ধর্মের নামে পশুহত্যা করিলেই নরহত্যার আয়োজন করিতে থাকিব, ইহাকে অত্যাচার ছাড়া আর কোনো নাম দেওয়া যায় না।'

কবি এই বাস্তব সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, ভারতবর্ষের অনৈক্য ইংরেজসৃষ্ট। ইংরেজ রাজত্বে আমরা এক শাসন পেয়েছি, কিন্তু ঐক্য পাইনি। ঐ ঐক্য বাইরের, এ ঐক্য সামান্য আঘাতেই বিনষ্ট হয়। ইংরেজ রাজত্বে যে ঐক্য আমরা পেয়েছি তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত ক'রে কবি বলেছেন, 'এ ঐক্য জড় অকর্মক সজীব সকর্মক নয়'। কিন্তু মানুষের ওপর কবির অসীম বিশ্বাস। গতিশীল মানুষের দুনিবার বেগ কবির আবেগ সমৃদ্ধ বাগ্মীতার পরিস্ফুট—সকল বড়ো জাতির ইতিহাসেই এই গতির দুনিবার আবেগ বার্থতা ও সার্থকতার উপল বন্ধুর পথে গর্জিয়া, ফেনাইয়া, বাধা ভাঙিয়া চুরিয়া, ঘুরিয়া পথিতেছে।'

কবি গভীর ভাবেই লক্ষ্য করেছেন যে, ইংরেজ ভারতবর্ষের মানুষকে করে তুলেছে নিষ্ক্রিয়। ভারতবাসী বক্তা-শ্রোতৃত্বের উপলব্ধ ছাড়া দেশসেবার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার সুযোগ পায় না। তবু সমগ্র ইংরেজ জাতিকে তিনি শত্রু ভাবতে পারেন নি। যে স্বার্থপর ইংরেজ ভারত-বর্ষের শাসনযন্ত্রের চালক তাকে কবি বলেছেন, 'ছোট ইংরেজ'। আর যে ইংরেজ বিশ্বমৈত্রীর স্রষ্টা তাকে তিনি বলেছেন, 'বড়ো ইংরেজ', ছোটো ইংরেজের প্রতি কবি কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে কঠোর প্রতিবাদ এবং তিক্ত কটু ভাষণ। কিন্তু বড়ো ইংরেজের প্রতি কবির শ্রদ্ধার অন্ত নেই। আধ্যাত্মিক মনোভাব নিয়েই কবি ঘোষণা করেছেন—'বড়ো ইংরেজ একথা বুঝিবেই যে, বালির উপর বাড়ি

নির্মাণ করা চলে না, এদের শক্তিহীনতার উপরে অপরের শক্তির ভিত্তি কখনোই পাকা হইতে পারে না।'

পারস্পরিক অন্তরের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা আছে ইংরেজের অবজ্ঞা সত্ত্বেও তাকে কবি স্বীকৃতি জানিয়েছেন। 'আধ্যাত্মিক বলিয়া আমাদের আধুনিক শাসনকর্তারা আমাদের পরে যে কটাক্ষ বর্ষণ করিয়াছেন তাহা সহ্যসীমার শেষ পর্যন্ত সহ্য করিয়াও আমরা দুঃখবোধ করিব না।'—এই উক্তির মধ্যে 'সহ্যসীমা' শব্দটি লক্ষণীয়। কবির মতে কৃচ্ছ্রসাধন ও দুঃখস্বীকৃতির মধ্যে দিয়েই আধ্যাত্মিকতা বস্তুটি লভ্য। 'দেশ আমার দেশ সে তো কেবল এখানে জন্মিয়াছি বলিয়াই নয়; এদেশের ইতিহাস সৃষ্টির ব্যাপারে আমার তপস্যার উপর সমস্ত দেশের দাবী আছে বলিয়াই এদেশ আমার দেশ, এই গভীর মমত্ববোধ যদি দেশের লোক অনুভব করিবার উৎসাহ পায় তবেই এদেশে ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাস গৌরবান্বিত হইবে।'—মনের আধ্যাত্মিক ভূমি থেকেই কথাগুলো এসেছে বলে 'তপস্যা' শব্দটি এখানে ব্যবহৃত। ইংরেজের গৌরবকে গৌরবান্বিত ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত করেছেন তিনি। ইংরেজকে তিনি শত্রু ভাবতে পারেন নি। এইখানেই গান্ধীজীর সঙ্গে কবির মিল। ভৌগলিক সীমার দ্বারা কবি তাঁর ঔদার্যকে খণ্ডিত করতে পারেন নি হোমরুলের মধ্যে ভারতের মঙ্গল এবং ইংরেজের ঔদার্য কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। তিনি আরো বলেছেন যে, প্রকৃতির বশেই মানুষ রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে মানসিক সংকীর্ণতা প্রকাশ করে। ধর্ম রিপুর দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে উপস্থিত কালকেই মানুষ বড়ো করে দেখে থাকে। কিন্তু ধর্ম জিনিসটা শাশ্বত, দীর্ঘ-কালের কথা ভাবলে তাকে অস্বীকার করা যায় না।

কবি স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন—'ইউরোপীয় সভ্যতার মূল ধারার সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার একটি বড় পার্থক্য আছে।' কবির মতে ভারতবর্ষের সমস্যাগুলোর রূপ হচ্ছে সামাজিক। সে সব সমস্যার সমাধানে চাই সামাজিক সামঞ্জস্য। ইউরোপের উগ্র ব্যক্তিতান্ত্রিকতার কঠোর সমালোচক রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন—'এই দুর্বৃত্তিরই নাম ব্যক্তিতান্ত্রিকতা, যেখানে সর্বজনীন আত্মম্ভরিতা। এ হলো রিপু, ঐক্যতত্ত্বের উল্টোদিকে অর্থাৎ আপনার দিকটাতেই এর টান।' কবির মতে এই আত্মসর্বস্ব ব্যক্তিতান্ত্রিকতা ব্যক্তিত্বের বিকাশে বিঘ্ন ঘটায়। শিক্ষা প্রসঙ্গেও আলোচনা করতে গিয়ে কবি একথাই ঘোষণা করতে চেয়েছেন যে, ব্যক্তিসত্তাকে বিনষ্ট ক'রে যে শিক্ষা এক যান্ত্রিকতার ছাঁচে মানুষ গড়তে চায় তা ব্যক্তিবিলোপী সর্বনাশা ষড়যন্ত্র। শিক্ষাবিধিকে নিয়ে ব্যবসাতের ভিমে তা দেওয়াকে কবি কটাক্ষ করেছেন।

'কালান্তর' গ্রন্থের 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধটি স্মরণ করিয়ে দেয় 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের 'সবুজের অভিযান' কবিতাটির কথা। দুটি লেখাই প্রকাশিত হয় 'সবুজ পত্র'-এর প্রথম সংখ্যাতে। একই ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ দেখা যায় এই দুটি লেখায়। 'সবুজের অভিযান' কবিতার প্রধান লক্ষ্য তারুণ্যের জয়গান হলেও রবীন্দ্রনাথের যান্ত্রিক চেতনাও এখানে দুর্লভ নয়। কবির বাঙালী জাতির মনে নাড়া দেওয়ার অভিপ্রায় থেকেই রচিত হয় 'সবুজের অভিযান' কবিতাটি এবং 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধটি। সারাবিশ্ব পরিক্রমা করে পাশ্চাত্যদেশের গতিশীল জীবনধারায় রবীন্দ্রনাথ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁ-র creative evolution গ্রন্থের 'Elanvital' গতি-তত্ত্বের সঙ্গেও তিনি পরিচিত হলেন। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের 'বলাকা' 'চঞ্চলা' ইত্যাদি কবিতায় গতিতত্ত্বেরই সুর। 'পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে বেগের আবেশ' কবির কাছে অনিবার্য হয়ে উঠেছে বলাকার পাখায়। তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যবীণার তার যে সুরে বাঁধলেন তার সঙ্গে

বের্গসঁ'-এর সূত্রের পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতার সন্ধানী। বের্গসঁ'-র গতিতত্ত্বের সূত্রে আছে পরিণামহীনতা—তা পূর্ণতার সন্ধান করতে জানে না। আর একটি কথা স্মরণে রাখা দরকার যে, রবীন্দ্রনাথের রক্তের ভিতরে আবাল্য বেজেছিলো ব্যাকুল বাঁশি, গতির সুর। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' বৈশবেই তাঁর কবি-স্বভাবের মর্ম থেকে নির্গত হয়েছে। এর মূলে কোনো বিদেশী প্রভাব ছিলো না। ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রের 'চরৈবেতি' মন্ত্র এবং পদ্মার গতিময়তাও রবীন্দ্রনাথের জীবনে এনেছে গতির নেশা। 'দুই পাখি, দুরন্ত আশা, এবার ফিরাও মোরে, দীক্ষা ইত্যাদি কবিতায় এবং আমাদের যাত্রী হলো শুরু, আমি চঞ্চল হে, আর দেরি নয় ইত্যাদি গানে তাঁর কবি-স্বভাবে নিহিত গতির নেশাই উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। স্বদেশের জীবনধারার রক্ষণশীলতা এবং জড়ত্বে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালান্তর' গ্রন্থের 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধেও দুরন্ত অবিবেচনার উত্তেজনা ও দুরূহের দুঃসাহসকে সমর্থন জানিয়েছেন—'পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই, দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস।' তবে কবির মতে চলার পদ্ধতির মধ্যে অবিবেচনার কোনও প্রয়োজন, বিবেচনার সংযমই দরকার। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় কবির সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি—'যে পথে চলাকেরা বত ও যে পথে ঘাসফুল জন্মায় এবং ঘাসের মধ্যে, নানা রঙের ফুলও ফোটে। সে ঘাস সে ফুল সুন্দর, একথা কেহ অস্বীকার করিবে না। কিন্তু পথের সৌন্দর্য ঘাসেও নহে, ফুলেও নহে—তাহা বাধাহীন বিচ্ছেদহীন বিস্তারে। তাহা ভ্রমর গুঞ্জনে নহে কিন্তু পথিকদলের অক্লান্ত পদধ্বনিতেই রমণীয়।'

'কালান্তর' নিছক রাজনৈতিক প্রবন্ধের সংকলন নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীন পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার আলোচনা করেছেন এই গ্রন্থে। বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কালান্তর অপরিহার্য। গান্ধীজি পরিচালিত আন্দোলনগুলোয় যে আবেদন-নিবেদনের ভাষা ধ্বনিত হয়েছে সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত ব্যক্ত করেছেন ব্যাঙাচি-নিকের পত্র, চরকা, শক্তিপূজা, সমস্যা ইত্যাদি প্রবন্ধে। 'চরকা' প্রবন্ধে কবি বলেছেন—'সকল মানুষ মিলে মৌমাছির মতো একই নমুনার চাক বাঁধিবে, বিধাতা এমন ইচ্ছে করেন নি।' সব মানুষকে একই ছাঁচে ফেলে বৈচিত্র্যকে খর্ব ক'রে ঐক্যসৃষ্টির একদেশদর্শী প্রয়াসকে রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করতে পারেন নি। ব্যাঙাচিনিকের পত্র প্রবন্ধে অসংযত লোভের উত্তাপনার প্রতি সমধরবাদী কবির অবিশ্বাস ধ্বনিত হয়েছে—'যতোক্ষণ এই লোভ আছে ততোক্ষণ জগতে শান্তি আনে পীস্ কন্‌ফারেন্সের এমন সাধ্য নাই।'

'কালান্তর' গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যনিরপেক্ষ আত্মনিবেদন। তথ্যকে এড়িয়ে মূল সিদ্ধান্তকে আকস্মিক পরিণতি দেওয়ার কৌশল তাঁর করায়ত্ত ছিলো। 'কালান্তর' প্রবন্ধে মুসলমান-সংক্রান্ত প্রসঙ্গে কোনো বিস্তৃত তথ্যপরিবেশন না ক'রেই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, মুসলমান আক্রমণ চতীয়তনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দেওয়ার পক্ষে যথোচিত হয়নি। এ গ্রন্থে নানা প্রসঙ্গে তিনি উপনীত হয়েছেন। কিন্তু যা বক্তব্যের উপযোগী তা সহজেই বেছে নিয়েছেন তিনি। কখনো আকস্মিক প্রস্তাব এনে প্রচলিত সাধারণ মতবাদকে আঘাত ক'রে নিজস্ব মতবাদকে নতুন ধরণের আবেগের বিস্তারে এবং শিল্পসমৃদ্ধ ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সমস্ত গ্রন্থটিতে এক আশ্চর্য গাম্ভীর্য। লেখকের বহুবিষয়ণের মধ্যে পাঠক হারিয়ে যায় না।

রবীন্দ্রনাথ কখনো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অথবা ভৌগোলিক পরিসীমার দ্বারা তাঁর সার্বভৌম মানবচিন্তার ঔদার্যকে খণ্ডিত করেন নি। হিন্দুমুসলমান সমস্যার আলোচনায় তিনি সম্পূর্ণ

প্রথামুক্ত এবং ধর্মনিরপেক্ষ বিচারক, মুসলমান রাজত্ব ও ইংরেজ রাজত্বের তুলনামূলক আলোচনায় তিনি শ্রদ্ধাশীল প্রবক্তা, এবং শিক্ষা ও সমাজের আলোচনায় তিনি লোকসাধারণের মুখরক্ষী হিতৈষী বন্ধু। প্রথা যেখানে মানুষকে লাঞ্ছিত করেছে সেখানে কবি অহিংসা ধর্মের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন, ইংরেজ শাসনতন্ত্র যখন মানুষের মঙ্গলবুদ্ধিকে প্রতিহত করেছে তখন কবি গতিশীল মানুষের বেগের আবেগকে উপলব্ধি করবার জন্যে ইতিহাসের দিকে তাকাতে বলেছেন, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিকতা অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ভাবনার উন্মুক্ত ইংরেজের কাছে উপচারিত দেখে কবি জাতিকে শরণযোগ্য কথা স্মরণ করিয়ে আত্মশক্তির মনোবল সঞ্চয় করতে বলেছেন। এক কথায় কবির ধর্ম, কর্ম ও মর্ম শাশ্বত বিশ্বপ্রেমের অভিজ্ঞির সূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে।

মহান
মে দিবস
দীর্ঘজীবী
হোক

স্মারক সংখ্যা :- ২০৪১ (১৩) জে. তথ্য. হাওড়া। তারিখ :- ১২ই মে ১৯৯৪

রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারী

বিনয় সরকার

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত মহিমা হৃদয়ে ধারণ করে সবিনয়ে আমি মহাকবির সুবিশাল সাহিত্যের একটি প্রান্ত ধরে টেনে দেখছি। এই প্রান্তের পরিক্ষেপের অধিকার আমারি (বন্দী-পুরুষ-সমালোচক অপেক্ষা, কারণ যাদের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তাদের যে আমি চিনতে পারি বেশী।)

নারী-সাম্রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ দেবতা, 'রাজরাণী' নাটকের সেই পুরন্দরের মত। নারীকে অনেক ক্ষেত্রে নারীর অপেক্ষা তিনি চিনেছেন বেশী। কবির বিশেষ লক্ষ্যে উন্মোচিতমর্ম্ম নারী কবির কাছে অসহায়।

কিন্তু এই অবলোকন কি সর্বস্তরের নারীর ক্ষেত্রে এবং সর্বক্ষেত্রের এই অবলোকনে সর্বদা কি নারী অতি স্বাভাবিক রক্তমাংসে গঠিত? নারী চরিত্রের সর্বদিক কি সম্যক উন্মোচিত?

এ সকল প্রশ্নের সময় আজ এসেছে। প্রতিভাকে গতানুগতিক পথে বন্দনার দায়ন্ত করে যাওয়া অপেক্ষা নিত্য নিত্য প্রতিভাকে নব নব ভাবে অনুসন্ধান করা, প্রতিভাকে নূতনরূপে আবিষ্কার করা শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রকৃষ্ট প্রণালী।

রবীন্দ্রনাথ যে-সকল অনির্ব্বচনীয়ার চিত্র এঁকেছেন, তারা অনেকেই—'অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা।'

নারী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি অনুধাবন মাত্র সংক্ষিপ্ত ও স্থূলভাবে আমরা একটি ছবি পাই—

"স্বাতন্ত্র্য-স্পর্দ্ধার মত্ত পুরুষেরে করিবারে বশ
যে আনন্দরস
রূপ ধরেছিল রমণীতে
সেই আদি ধ্যান মূর্ত্তিটিরে
সন্ধান করিছে ফিরে ফিরে
কবিকার মনে মনে।"—('সানাই')

নারীর মোহিনী মূর্তির ধ্যানে রবীন্দ্রকাব্য মোচ্ছার। অবশ্য পাশে পাশে আছে কল্যাণী মূর্তি। কখনও নূতন দিগন্তের উন্মোচন আছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যে নারীর প্রধানতঃ দুইরূপ—প্রিয়া ও জননী বিভিন্ন রচনায় কবি এই কথা বলেছেন বারে বারে।

'দুইবোন' উপন্যাসখানিতে তিনি স্পষ্টতঃ নারীকে করেছেন মা ও প্রিয়া—ধর্মা ও বসন্ত।

ঊর্ম্মিমালা বসন্ত ঋতু—প্রিয়া। শর্ম্মিলা মা-জাতীয়া নারী, ধর্মা, সেবা তার ধর্ম। এই দুইয়ের মধ্যে নায়ক শর্ম্মিলার স্বামী সমাজ মজুমদার বিচলিত, অবশেষে তার জীবনে প্রিয়া নারীর জয়। 'দুইবোনের' মর্ম্মার্থ এই।

প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথের সর্বরচনার উৎসে কবিসুলভ ভাব অথবা আইডিয়া। কবিমানসে প্রশ্নের কোন ভাবধারা এসেই নিবিড়ে প্রোথিত হে বারবার নানা আঙ্গিকে তার প্রকাশ। কবিতার ভাব কখনও নাটক ; নাটক কখনও নৃত্যনাট্য ; গল্প কখনও কবিতা, উপন্যাস, কথিকা রূপে কবির লেখনীতে রূপান্তর লাভ করেছে। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে ২৩ সংখ্যা চিহ্নিত কবিতার মধ্যেও এই 'দ্বৈরথের' সমাক রূপ নিহিত।

"কোন ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি
একজনা উর্বশী সুন্দরী"—

'রাত্রে ও প্রভাতে' ('চিত্রা') কবিতায় আবার এক নারীর দুইরূপ দেখা:

"রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি তুমি এসেছো প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে তুমি সমুখে উদিলে হেসে।"

নারীর প্রেম রবীন্দ্রনাথের মতে পুরুষের বন্ধন। লীলাবিভ্রম ও আসক্তি নারী পুরুষকে নিরন্তর মোহপাশে বদ্ধ করে রাখে ও অবশেষে তারশক্তি ব্যর্থ করে। অবশ্য পুরুষের দুর্বলতার প্রখর দৃষ্টিপাতের ফলে পুরুষও সময়ে প্রকৃতির ক্রীড়নক রূপে রবীন্দ্রসাহিত্যে দেখা দিয়েছে।

রবীনাথের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি 'চিত্রাঙ্গদার' 'অলৌকিক অস্ত্রধারী' পুরুষোত্তম বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনের রূপের মোহে ব্রতবিসর্জন গৌরবজনক নয়। নারীশিরোমণি বীরশ্রেষ্ঠা চিত্রাঙ্গদারও মদনের ফুল থেকে কৃপার প্রার্থনা জানাবার নয়। পরে অবশ্য রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদাকে কর্মময়ী সহ-ধর্মিনীর পদপ্রার্থিনীরূপে দেখিয়েছেন।

"নহি দেবী নহি সামান্যা নারী—
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে
সংকটে সম্পদে
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে
সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।"

এখানে উপরোক্ত দুইরূপ ভিন্ন নারীর অন্যরূপ পাই, আধুনিক অর্থে সে কমরেড্। কিন্তু আমাদের নালিশ পুরুষনিরপেক্ষ রূপ তার কেন হতে পারল না? পুরাণের অনুসৃতির জন্য না স্রষ্টার গোপনমনের মতামতের ? 'বিদায় অভিশাপে' তো মহাভারতকে লঙ্ঘন করা হয়েছে তাকে ব্যবসাদাররূপে চিত্র করে, শাপদাতারূপে নয়।

বীরাঙ্গনা ব্রতভঙ্গে অর্জুনের প্রত্যাখান তুচ্ছ করে যেতে পারত। নারীত্ব, অপমানে তার মধ্যে সুপ্তানারী জাগরূক হয়ে উঠে তপস্যা করল 'মৃতস্বা সুধার' ভরাবার বাসনায়। প্রেম ভিন্ন জীবন মৃত সে স্বীকার করল। সেই প্রেম আবার উপযুক্ত পুরুষের প্রতি প্রেম—সখী বা প্রজাবন্ধের স্নেহশ্রদ্ধার মধ্যে তার মন তৃপ্ত নয়।

রূপকের মধ্য দিয়ে মোহমুক্ত প্রেমের চিত্রাঙ্কনে কবির সৃষ্টি সার্থক। কিন্তু আধুনিক নারীচরিত্রের বিবর্তন বা এভোলিউশনের চক্রে বীরাঙ্গনার অন্য কোন পরিণতি পুরাণকে অতিক্রম করে সম্ভব ছিল কি না জানতে ইচ্ছা হয়।

'বাঁশরী' নাটকে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টই নারীর মোহিনীশক্তি ও তদ্ধেতু পুরুষের আসক্তিজনিত শক্তিহীনতার কথা লিখেছেন। সোমশঙ্কর বাঁশরীর কাছে দুর্বল। বাঁশরীর ভালোবাসা হয়তো একদিন তাকে টলিয়ে দিত ব্রত থেকে, তাই সুষমার সঙ্গে ভালোবাসাহীন বিবাহে পুরন্দর তাকে মুক্ত করলেন ব্রতের জন্য। বাঁশরী নিজে সেই মুক্তে সংযমের অঙ্গীকার পুরন্দরের কাছে না দিলে সুষমার সঙ্গে পরিণয় কি সোমশঙ্করকে ভালো করতে পারত? প্রেমে প্রতিহত হয়ে বাঁশরীর মত মেয়ের ব্যাকুলতাও একটু বিস্ময়জনক।

নারীপুরুষের প্রেম বহুক্ষেত্রেই রবীন্দ্রসাহিত্যে মোহ, টানাটানি, জয় বিজয়ের পর্যায়ে 'সানাই' কাব্যগ্রন্থের 'পরিচয়' কবিতায়—

"এমন সময় বেড়াজালের ভাঁজে পড়ল এসে আরেক মায়াবিনী
পালা কেবল নিপুণ হাতের সুকনিতে, একখানেই হল তার জিত"

'পুনশ্চ' পুস্তকে একই টানাটানি ও হারমানা নারীর বেদনা। 'সাধারণ মেয়ে' অসামান্য হতে চায়, বিদেশের সম্বর্ধনা সভায় খ্যাতি চায় বিদ্যায় শুধু নয়, নারিত্বের। এত আয়োজন কেন? শুধু এক বিমুখী পুরুষের মুগ্ধতার জন্য।

'বাঁশীওয়ালা' ('শ্যামলী') কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নারীর যে মন চেতনা আরোপ করেছেন, নিঃসন্দেহে নবযুগের নারীর frustration বা বৈফল্যবোধের চিহ্ন এখানে—

"ভালো লেগেছিল বিধাতা
তোমার গান মিশেছে আমার মনে
ছোটো আকাশে উড়ো প্রাণের পাগলামি।"...

"আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর—
ঝড়ের ডাক, জলের ডাক, আগুনের ডাক,...
...ঘরের নিকলনাতা উদাসী হাওয়ার ডাক।"

এই পংক্তিগুলি 'বাংলাদেশের মেয়েকে' বাধানিষেধের গতি লঙ্ঘন করাল না। সে 'শান্ত, ভালো' হয়েই রইল। তাই যদি রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহের ইঙ্গিত শুধু আছে, পূর্ণ পরিণতি নেই। তাই বাঁশীওয়ালার সুরে সুরে যে কল্পনায় সৃষ্টি হয়, সেখানে নারীর কাল্পনিক মুক্তি মাত্র। আর মুক্তি এই নারী চায় কোথায়? প্রেমের দুঃসাহসে 'ঘোমটাছাড়া নারী রূপে সে সুরকারকে চমক লাগাতে চায়। 'মনের আসনে' মোহিনীরূপে স্থিতি তার কাম্য। প্রতিদিনের রক্তসিক্ত পথের পথিকা নয় সে।

রবীন্দ্রকাব্যে নারী 'অমৃত' পেল ('অমৃত'—শ্যামলী) উপকরণের মোহ থেকে মুক্তি এনে প্রেমই অমৃত হয়েছে। কিন্তু নারী নিজের হৃদয় থেকে কোন অমৃত খুঁজে পেল না আপনার স্বাধিকার স্বাতন্ত্র্যে।

এখানে 'মালঞ্চ' নামক ছোট উপন্যাস বা বড় গল্পটির কথা মনে পড়ে। 'দুই বোনের' সঙ্গে তুলনীয় একটি ত্রিভুজের ছক 'মালঞ্চ'। সরলা জেলে গেল, কিন্তু পুরোপুরি ছেলের জন্য নয়, বিবাহিত দুইসম্পর্কীয় ভাই আদিত্যের প্রেম থেকে সরে যাবার জন্য। ঊর্মি বিদেশে গেল ভগ্নীপতি শশাঙ্ককে ভুলে যেতে।

দুই ক্ষেত্রেই নারী দুঃসহতার পটভূমিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে তাদের সঙ্গে সংগ্রাম করেনি। সে পলাতকা হয়েছে।

তবু রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয় স্রষ্টা, তাই তাঁর সৃষ্টি ঊর্মিমালা বলতে হয়তো নাই হোলো। ভুল করতে ভয় পাই।"

এখানে আধুনিকার মর্মবাণী। সাহস দেখিয়ে ঊর্মি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পথে ফুটে উঠেছে।

'যোগাযোগে' রবীন্দ্রনাথের মানসকন্যা কুমুদিনীর মধ্যে যেরূপ দেখি, সে রূপের সৃষ্টিতায় একটি প্রান্ত এসে ঠেকেছে আধুনিকীর অঙ্গে। কবি রবীন্দ্রনাথ গদ্য উপন্যাসে বলেছেন, "এই যে রক্তমাংসের অসামঞ্জস্য এতে মেয়েদের যেমন মর্মান্তিক করে মারে পুরুষকে তেমন নয়।"

ঘরগৃহিণী, কর্মশীলা কুমুদ চিত্রে সকল সৃষ্টির মধ্যেই স্রষ্টা কামনাময়ী। কিন্তু পুত্রের জন্মসূচনায় অনাচারী, অত্যাচারী স্বামী মধুসূদনের কাছে ফিরে যাওয়ায়,—সে শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে তুলনীয় সংসর্গে রত ছেলেও, কুমুকে একটু বেশী সেকালিনীর মত লাগে। অতিতাবোধে তার যে বাক্তি যাচ্ছন্ন এখানে সেটি বাহিত। সন্তান সম্পূর্ণ পিতার, এই বোধ বর্তমানের নারীর নয়। নারী সন্তানকে সম্পূর্ণ আপন বলে মনে করেও সন্তানের জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। 'কথা ও কাহিনীর' 'ব্রাহ্মণ' কবিতায় সত্যকামজননী জবালার সাহস মনে পড়ে: "বহু পরিচর্যা করে পেয়েছিনু তোরে। জন্মেছিস তর্কহীনা জবালার ক্রোড়ে। গোত্র তব নাহি জানি এই শক্তিময়ীকেও রবীন্দ্রসাহিত্যে পাওয়া সহজ নয়।

'সবলায়' কবি বলেছেন— "নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেহ নাহি দিবে অধিকার ?" ('মহুয়া')

তাঁর সেলফরাপূর্ণাপ্রতিষ্ঠা, আত্মসম্মানী, অসামান্য নায়িকা কুমুদিনী কেন ভাগ্যকে জয় করার অধিকার পেলনা? অবশ্য সবলা বলেছেন "যাবনা বাসর ঘরে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী, আমারে প্রেমের বীর্যে কর অগ্রগামী"। অতএব এই সবলা চান প্রেম অবশ্যই, কিন্তু প্রেমের স্বাধীনতা। পুরুষনিরপেক্ষ নারী যে রবীন্দ্রনাথ সহজে সৃষ্টি করতে চাননি, এ তারই প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের নারীর প্রতি কোমল সহানুভূতিশীল মনটির দেখা পাই 'পলাতকার' 'ফাঁকি', 'মুক্তি' 'নিষ্কৃতি' 'মায়ের সম্মান', 'কালো মেয়ে' ইত্যাদি বহু কবিতায়। 'শ্যামলীর' 'দুর্বোধ' কবিতায় নারী রহস্যসৃষ্টি যত্নের ছায়া এখানেও।

বিচিত্র ও বিস্তৃত রবীন্দ্রমানসের যথাযথ আনুষ্ঠিক হিসাবে নিখুঁত মাপের এক কাইতে মেলে গবেষণার বহু বিস্তৃতি আবশ্যক। একটি মাত্র রচনার পথ ধরে কবিকে ব্যক্ত করতে গেলে অন্তবর্তী আর একটি রচনা মেলে। তাই সামগ্রিক হিসাবে ছোটা কথাটা বলাই সাধারণবুদ্ধি পাঠকের ধর্ম।

'কালান্তরে' দেখি—"সমাজবন্ধনের প্রথম কাজটি মেয়েদের। গৃহিনীরূপে, জননী-রূপে মেয়েদের যে কাজ সে তার আপনকাজ, সে তার স্বভাবগত। তার শিক্ষা, তার বিশ্বাস বাহিরের বৃহৎ অভিজ্ঞতার মধ্যে সত্যতা লাভ করবার সম্পূর্ণ সুযোগ পায়নি।"

কবি জ্ঞান অর্জন ও সমাজ সেবার কাজে মেয়েদের আহ্বান করেছেন—কিন্তু এটি বহিরঙ্গ। এই প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে এদেশের নারীর নারীত্ব তথা সত্তা-সার বা essence।

চিররোমান্টিক কবি বাংলার মন হরণ করেছেন চিরন্তন রোমান্সের সুরে। 'কিনু' গোয়ালার গলির হরিপদ কেরানী 'পরণে চাকাই শাড়ী, কপালে সিঁদুর' বধূর স্বপ্ন দেখে থাকে ('পুনশ্চ'-'শেষ')।

'আকাশপ্রদীপের' 'বধূ' কবিতাটিও আমরা রবীন্দ্রমানসের এক স্বাক্ষরীরূপ বলে নিরাপদে গ্রহণ করতে পারি—

"ঠাকুরমা ছড়াতালে যত' যেত পড়ে—
তারিখানা মনে আছে—'ষষ্ঠ আসে চতুর্দোলা চড়ে
আমকাঁঠালের ছায়ে,
গলায় মোতির মালা, সোনার চরণ-চক্রপায়ে।"

অবশ্য অসাধারণ প্রতিভাশালী অসংখ্যরেখ লেখক, বৈষণক্তিশালী রবীন্দ্রনাথের মুগ্ধ কবিমানসে শুধু যুগের হাওয়া লাগত কখনও, কখনও নারীপুরুষের বৈতলীলায় উৎসুক চিত্ত ছেয়ে থাকত দূর কোন নারীর ছায়ায় প্রতি গৃহের কল্যাণশ্রীবিমণ্ডিত, ভালবাসায় নিষেধিত-প্রাণা নারীত্বের ছায়াময় তীক্ষ্ণদৃষ্টিসক্ষম চোখ তাঁর কখনও দেখেছে সেই মহিমময়ীকে যিনি স্বয়ং সম্পূর্ণা।

'গল্পগুচ্ছের' তৃতীয়খণ্ডে কয়েকটি গল্প আছে, সেখানে নারীর নবরূপায়ণ সৃষ্টি করে। ১৩২১ সালে লেখা 'অপরিচিতা' গল্পে নারীর পুরুষনিরপেক্ষ রূপের তিনি আভাস দিয়েছেন। কল্যাণী বাধাপ্রাপ্ত বিবাহের বরের পুনরায় বিবাহ প্রস্তাব গ্রহণ করেনি, বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সে স্বীকার করেনি।

'গল্পগুচ্ছের' তৃতীয় খণ্ডের গল্পগুলো প্রধানতঃ '২১ থেকে লেখা। কবি অসহযোগ আন্দোলনের বহ্নিশিখা ১৯২১-এর অসহযোগ তাঁর চিন্তায় নিষেধিতাকে সুদূর প্রসারী সৃষ্টি দেখেছে। দেখেছেন তিনি।

'সবুজপত্রের' আদিযুগে গল্পগুলি লা'র হয়েছিল। আধুনিকতার নূতন ঢেউ সেখানে, সর্বত্র সব প্রোগ্রেসিভ কিনা প্রগতিপন্থী। বিতর্কিত 'ঘরেবাইরে' এবং 'চতুরঙ্গের' চারটি পরিচ্ছেদ 'সবুজ পত্রে'র সেই যুগে।

'স্ত্রীর পত্রে পাওয়া যায় নারীমনের নূতন বিলাস, পাওয়া যায় নারীর অসন্তোষ। ভালোবাসা সত্ত্বেও স্বকীয় আত্মমর্যাদার বাঁচবার জন্য স্বামীসংসার ত্যাগ করতে দ্বিধা বোধ করেনা নবযুগের মৃণাল। এই ইঙ্গিতবহ আর একটি গল্প 'পয়লা নম্বর'। অনিলা মৃত শ্বশুর নিয়ে সমস্ত মোহ ত্যাগ করে, স্বামী, সংসার, এমনকি প্রেমও। ১৩২৪ এর এই গল্পটি 'অপরিচিতা' পর্যায়ে। এরকম নারী রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি করেছেন কম কিন্তু করেছেন মাপে মাপে। যদি এই

নারীকুল নবযুগের উদ্বিগ্নবধূ, তবে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন সে যুগে তাদের সৃষ্টি করবে কে।
গল্পের মধ্যে অতি উল্লেখযোগ্য এক স্বল্প অসাধারণ মেয়ে 'হৈমন্তী'।

'বোষ্টমী' গল্পে আদ্যা সংসার সন্ধানে স্বামীর ভালোবাসা ছেড়ে এল (১৩২১)। গল্পপরিচয়ে অসংখ্য উদাহরণ ও উল্লেখযোগ্য গল্প চোখের সম্মুখে থাকলেও আলোচনা সম্ভব নয় এখন। 'গল্পগুচ্ছের' অন্যান্যখণ্ডের গল্পগুলি অধিকাংশেই পল্লীকেন্দ্রীক দেখানে স্নিগ্ধ সহজ পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে সুর মিলিয়ে সহজ মধুর নারীচিত্রগুলি যেন শ্রীহিতে বিকশিত।

('আপদ', 'শাস্তি', 'ছুটি', 'ব্যবধান' ইত্যাদি গল্পগুলি ও নানা আখ্যানে প্রেমে পরাভূতা নারীর চিত্র। কারণ রবীন্দ্রনায়িকার জীবনে সর্বাপেক্ষা বড় শক্তি প্রেম, নানা ভাবে যেন আছড়া। সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন বলে কথিত আছে, "তবু ওই পুরুষদের না হলেও তো চলে না, সখি।" ('মংপুতে রবীন্দ্রনাথ'—পৃঃ ১৮২) অনেকক্ষেত্রে নারীচরিত্রে অসঙ্গতি চোখে পড়লেও মনে হয় মোটা হাতে মোটা কথাটা তুলে নেবার বয়স এ নয়। ভাবলোক পরীক্ষিত সত্য একমাত্র ভাবাবেগে যাচাই চলবে। কবি নিজেই বলেছেন—"এতলোকে পুলিশসার্জেন্ট বানানো হয়নি—পাকে তার বাবা ছিলেন।" ('শাস্তি', 'প্রবাসী' ১৩৪০)

'প্রজাপতিতে' নলিনী বঙ্গের প্রেম আবার বহিঃপটের সমস্যার পটভূমিকায় / ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে দুইবার পুনর্লিখিত এই নাটক সম্বন্ধে কবির উক্তি: "নারীর ভিতর দিয়ে বিচিত্র সহজ প্রাণের প্রবর্তন যদি পুরুষের উদ্যমের মধ্যে সঞ্চারিত হবার বাধা পায়, তাহলেই তার সৃষ্টিতে যন্ত্রের প্রাধান্য ঘটে—প্রেমের মধ্যেই পূর্ণতা।" ('সাহিত্যযাত্রীর ডায়ারী')

সুতরাং প্রেমকে প্রয়োজন পুরুষের শুধু জৈবিক অর্থে নয়—জীবনের কর্মে সফলতার জন্য। আর নারীকে প্রয়োজন প্রেমের জন্য। অতএব নারী পুরুষের কাছে অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে কবি সুদূর বিশ্লেষণ ও সন্ধানে নারীকে চিরপ্রেয়সী এঁকেছেন। জনমনেও আছে নারীমাহাত্ম্য। বাংলা সাহিত্যে নারীকে এত ভালো কোন লোক দেখেছেন?

তবু নিরাসক্ত শ্রোতার মনে হয় প্রেমবিহীন কর্ম যদি বন্ধ হয়, তবে বৈষ্ণবীয় প্রেম, 'শেষের কবিতায়' অমিত-লাবণ্যের প্রেম, পরবর্তী যুগে 'তিনসঙ্গী' পুস্তকের 'শেষ কথায়' ('ছোট গল্পে'র পুনর্লেখন) অচিরার প্রেম কেন পরিণামে পূর্ণতা পেলনা?

রবীন্দ্রনাথের জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে যদেশীযুগের মেয়েদের সাধারণ সুখ দুঃখ-ভরা আত্মত্যাগ তাঁর কলমে নতুনতর নারীর সৃষ্টি করে। ভালবাসায় প্রেমবঞ্চিতা এরা নয়, কিন্তু প্রয়োজনে প্রতিহত করতে পারে। সে যুগে রবীন্দ্রনায়িকা বিবাহে প্রাধান্য দিলেও অচিরা, বিভা বিবাহের বন্ধন স্বীকার করেনি। কিন্তু তারা ডুবে থাকে ভালবাসায়। তত ডুবনের সন্ধান হয়তো যেন না সহজে।

'তিনসঙ্গীর' বিখ্যাত গল্প 'লাবরেটরীর' দুর্জ্ঞেয়চেতা সোহিনীও কিন্তু নিঃস্বার্থ জনপ্রেমী সোহিনী চরিত্রে আত্মবলের পশ্চাতে আছে নন্দকিশোরের প্রতি প্রেম।

বিশাল ও মহৎ 'গোরা' উপন্যাসে অপার মর্যাদাবোধে ও সংযমে নায়িকা সুচরিতা নানা বাধা হেতু গোরার সঙ্গে পরিণয় সম্ভব নয় জেনে গোরাকে গুরুর আসনে বসাল। পরে অবশ্য দেশসেবার যজ্ঞে গোরা নারীশক্তি সুচরিতাকে চাইল এবং তারা মিলিত হল।

একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যসূত্র আছে যে রবীন্দ্রনাথ এই নায়িকাকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন ও কাহিনী মিলনান্ত করেননি, কিন্তু সিস্টার নিবেদিতা সুচরিতা কর্তৃক গোরার প্রত্যাখ্যান অনুমোদন করেননি বলেই স্রষ্টা নিজেই যবনিকা টেনে দেন। সিস্টার'নকে লিখিত ১৯২২ এর পত্রটিতে লেখা—"She (Nivedita) was quite angry at the idea of Gora being rejected even by his disciple Sucharita Owing to his foreign origin. you won't find it in Gora as it stands now." (চিঠিপত্র—৬)

বহির্জগতের সমস্যা 'গোরার' নায়িকাদের উদ্বেল করে, সামাজিক পরিবেশ লঙ্ঘন না করে তারা বাইরের কাজ করে অন্তরিক্ষর। ১৯২০-এ গোরার যে পাতাল ঘর, সে পাতাল সংস্কারমুক্তি লাভ করে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে (১৯১৩)। পরবর্তী যুগে 'চার অধ্যায়' রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন সোজাসুজি রাজনীতির পটে। এখানে অহিংস ও সহিংস রাজনীতির কিছু সংঘর্ষ পাওয়া যায় (১৯৩৪)। রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস।

'গোরা' উপন্যাসে নানা সমস্যা, হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্মের সংঘাত ইত্যাদির মধ্যে একটি সাহসিক নারী 'ললিতা', যে সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করতে জানে।

'কাহিনী চতুষ্টয়ে' শচীনকে ভালোবাসে, কিন্তু প্রত্যাখ্যানে নব জন্ম গ্রহণ করে। শচীন তার গুরু হয়, শ্রীবিলাসকে সে বিবাহ করে এবং ভালোবাসে।

প্রথমে বিধবা কাহিনী গুরুবাদে সা ভাসায়নি। গুরুদেবকে সমর্পণ অবজ্ঞা, প্রকাশ্যে শ্রীবিলাসকে শচীনের সম্মুখে সমাদর, তীক্ষ্ণ বচনবিন্যাস—সমস্তিকার মধ্যেই একজন অচেনা সাধারণ নারীকে দেখি। চার্বাককে দর্শনের ভাত তার মুখে। কিন্তু এমন নারীও 'পাথর' মাটীতে প্রাণ দিয়ে ফেলে। শচীনের পদে অবলুণ্ঠন তার।

গোরার তালসমুলতরুণ মুগ্ধ করেছিল সুচরিতাকে। পুরস্কারের সভায় 'বীরপূজা' সুষমাকে মুগ্ধ করেছিল, শচীনের ধর্মপ্রাণ ব্রতীরূপ কাহিনীকে মুগ্ধ করে। কঠোরতার সাধনার রূপের বিকাশ রবীন্দ্রনায়িকাকে ভোলায়। শেষে মধুর 'সিরীতি রসের সার' নায়কমূর্তি নয়।

'ঘরে বাইরে' ঘর ও বাহিরের সংঘাত। নিখিলেশ বিমলাকে বাইরে এনেছিল বাইরের মধ্যে প্রেমকে চিনে নেওয়ার জন্য। নিখিলেশের "অত্যন্ত সাদা ফিকে রঙের স্বদেশীতে" বিমলা 'মনের মধ্যে রস পায়নি।' চড়া ও কড়া রং সন্দীপের মক্ষীরানী বিমলাকে একেবারে কেন্দ্রভ্রষ্ট করে ফেলল সন্দীপের প্রতি দায়ুয়িক মোহে। অনেক কারণ দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তবু বাইরে পদার্পণ মাত্র বিমলার কেন্দ্রচ্যুতি নারীজাতির পক্ষে শ্লাঘার নয়। কবি বলেছেন—জোর করে যে বিজয়ী নারীকে জিতে নেয় তার স্থান নিশ্চিন্ত নারীজীবন তবু পাঠকের অনেক প্রশ্ন থেকে যায়। অমূল্যকে সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথ বইটির শেষ রক্ষা করলেন। অমূল্যকে পেয়ে বিমলা যেন অবলম্বন পেল—'আমার মধ্যে যা জেগে উঠল।' বিমলা বন্ধ্যা ছিল, তাই বোধ হয় তার অতৃপ্তি, অশান্তি। অবচেতন মনে সন্তানবাসনাই সে নিশ্চয় পূর্ণ হয়ে উঠতে চেয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচেতনে মনে স্বদেশপ্রেম ও রাজনীতির একটি বিশেষ রূপ ছিল। নানা সংঘাত, নানা আন্দোলন, ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারীর ক্রমবিকাশের প্রণালী চিহ্নিত।

ক্ষিতিমোহন সেনের বর্ণনা থেকে জানি শুভদাটে ১৯২০তে সভা করতে যেয়ে রবীন্দ্রনাথ আশ্রমবাসীদের 'বনিতাবিশ্রাম' নামক মহিলা প্রতিষ্ঠানে তৎকালীন রাজনীতির নেশায় মশগুল

নারীদের উদ্দেশে বলেন, "মহাকবি কালিদাসের নামে, তোমাদের আমি অনুনয় করি।..... রাজনীতি, যুদ্ধনীতির বার্থ অনুকরণ না করে পুরুষপ্রথার দাসত্ববন্ধন হ'তে মুক্ত হও।" ভারতী'—১২৩৪)

অবশ্য প্রেমের দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্ত তিনি কখনও হ'তে বলেননি। ১৯১৭ ১৮ খৃষ্টাব্দে কবির মুখে শুনি—"She must restore the lost social balance by putting the full weight of the woman, into the creation of human world" ('Personality' —Women)'.

কেবলমাত্র পুরুষচালিত জগতের প্রতি একদেশে কবির মতে। তিনি নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন স্বীকার করেছেন, কঠিন মাটিতে আহ্বান করেছেন, পরক্ষণেই স্মৃতিবচনে গৃহসীমানা নির্দেশ করে দিয়েছেন।

যতদিন কবি জীবিত ছিলেন ততদিনে নারীর কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা ও উপার্জনের প্রয়োজন তাঁর দেখবার কথা ছিল। অবশ্য তাঁর মুখে মুক্তোত্তর পৃথিবীর 'ওয়ার ব্রাইড' অনটন দেখা যায়নি।

অন্য এক কথা, নারীকে এই মানবিক জগতের সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব কবি নানাস্থানে দিয়েছেন। মানবিক উৎপাদন বৃদ্ধি করাও এ দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। তা'লে তাকে শ্রমনিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পুরুষের পাশে দাঁড়াতেই হয়। আদিযুগে এবং এখনও গ্রামজীবনে বা শহরের কোন কোন কাজে যা চাষবাস, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি নানা কাজে নারী সে দায়িত্ব পালন করে। উচ্চ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অথবা অভিজাত শ্রেণীর কথাই কবির মনে ছিল।

কবি যদি সক্রিয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ না চান তবে কেন 'চার অধ্যায়ে' এলাসহার সৃষ্টি করলেন? বাংলাদেশের বিপ্লব ও সন্ত্রাসবাদের ভীষণ ও নেতিবাচক রূপটি দেখাতে। কিন্তু এলাও অতীনের সুতীব্র ভালবাসা ও প্রেমোপখানই উপন্যাসের মূল কথা। একথা রচয়িতা নিজেই স্বীকার করেছেন। 'দেশের কাজে যাবজ্জীবন', যাবজ্জীবনিনী এলাও প্রেমে পুরুষচরণে আত্ম-সমর্পিতা। অভিজাত ও সাহিত্যিক অতীন্দ্র টিমারের ফার্স্ট ক্লাসের ডেকে চলার দেখা পাওয়া মাত্র সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ পথে চলে এল এলার আকর্ষণে। একটি কবিতায় তার মর্মবাণী পাঠাই—

"প্রথম দেখার আলোর রাঙা সেদিন চৈত্রমাস,
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।"

এই কাহিনীতে যা কিছু অবাস্তব বা বিতর্কমূলক কবি নিজের পক্ষে তার অজস্র যুক্তি দিয়েছেন, "My religion is essentially a poet's religion."

'প্রেমের কবিতায়' লাবণ্য ইতিপূর্বে রবীন্দ্রসাহিত্যে অনাবিষ্কৃত। ইন্‌ডিপেন্ডেন্ট নারীর মর্যাদাশীল ব্যক্তিসত্তার আরতি এইভাবে রবীন্দ্রনাথে প্রথম। শিতা অবনীশের দ্বিতীয় বিবাহ দিল লাবণ্য তাঁর হৃদয়হরণী বিধবার সঙ্গে। পিতার অর্থ সে আর গ্রহণ করল না। এখানে দৃঢ় ব্যক্তিস্বাধীনতার পাদপীঠে নারীর দৃপ্ত পদক্ষেপ দেখালেন রবীন্দ্রনাথ। অর্থনৈতিক পরাধীনতাই যে নারীর ক্ষেত্রে প্রধানতঃ আত্মিক পরাধীনতার ভয়ঙ্করতা এই সত্য তিনি খোলা চোখে দর্শন করলেন (১৯২৯)। রবীন্দ্রনাথ নারীকে জীবিকায় ভাসিয়ে যাবজ্জীবিনী করবার প্রয়োজন বোধেননি। তাঁর নারী জানের জন্য উচ্চপাঠ নিয়েছে সত্য, যথা : 'নৌকাডুবির' হেমনলিনী, 'অধ্যাপক' গল্পে কিরণ-বালা, 'নামঞ্জুর' গল্পে অমিয়া, বাঁশরী নাটকে বাঁশরী ইত্যাদি। কিন্তু তারা বিনিময়ে অর্থোপার্জন-

কাহিনী হয়নি। বরঞ্চ শেষদৃশ্যে সংক্ষিপ্ত অসমাজাতীয় দুইটি গল্প (১৩৬৯) 'শেষ পুরস্কার' ও ১৩৬৮-এ 'প্রগতি সংহারে' নারী ভূমিকা অঙ্কনে লিপ্ত। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়ে, দীনতার ছাপই সেখানে। প্রগতিসংহারে মুন্সীজির কৃষ্ণভাবনের ভূমিকাঙ্কনের পশ্চাতে রয়েছে প্রেম।

'শেষের কবিতা' ব্যর্থ—উপন্যাসে উচ্চশিক্ষিতা মহিলার অভাব নেই। যিনি মোদ বটানিতে কার্ভ এম. এ-তে। তার কাজ অধিতের জন্য 'পায় চেয়ে তাকিয়ে' থাকা, 'ইসারা করলেই ছুটে এসে পড়ে।'

বাঁশরী মিলিতি ইউনিভার্সিটির ছাপদারা, রূপের তার দরকার হয়না। তার কাজ কিন্তীসকে নিয়ে সময় কাটানো ও সোমাদুরের প্রেম নিয়ে টানাপোড়েনের খেলা। লীলা কার্ভ ক্লাশ এম.এ. ডিগ্রী নিয়ে আবার লাবেল করেছে। তার বিদ্যা রসনায় কিন্তীসকে রেখেছে। 'চার অধ্যায়ের, মহৎ ব্যক্তিক্রম এলা, কিন্তু সেও আদর্শের তাগিদে ইন্দ্রনাথের নির্দেশে।

রবীন্দ্রনায়িকা সাধারণতঃ বিদুষী, অবশ্য প্রায়শঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ মারা নয়। তারা সমাজসেবিকা হয়না, পরহিত মূলক কর্ম বহুলোকের উদ্যোগে, অনেকের সঙ্গে মিলে গঠনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ তাদের দেখিনা। রাজনীতির সক্রিয় কর্মী হিসাবে নারীর বিষয়ে মতামত তো আমরা দেখে নিয়েছি। রবীন্দ্র-নায়িকা উপার্জনের জন্য মোটেই ব্যস্ত নয়, সেই প্রয়োজন দেখা যায়না।

বিদুষী এই নারীরা কিন্তু সর্বংসহা নারী মাত্র। পুরুষপ্রেমে বিহ্বল তারা। 'সানাই' কাব্যগ্রন্থে 'পরিচয়' কবিতায় দুই নারীর এক পুরুষকে নিয়ে টানাটানি, 'যাত্রাবিনী' রমিতার কথা পূর্বেই দেখেছি আমরা।

'পুনশ্চ' কাব্যপুস্তকে 'সাধারণ মেয়ে'র চাওয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সমস্ত নায়িকাগুলীর, বিদুষীগুলীর মর্মবাণী নিহিত। আবার কবিতাটি স্মরণ করি।

মালতী লেখকের কলমের এক আঁচড়ে গড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হ'তে চায়, য়ুরোপে যেতে চায়। সেখানকার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবৃন্দ—"দল বেঁধে আসুক ওর চারদিকে।"

জ্যোতির্বিদের মত আবিষ্কার করুক ওকে "শুধু বিদুষী বলে নয়, নারী বলে।" অতএব নারী বিদুষী হয়ে তৃপ্ত নয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে তৃপ্ত নয়। বিশ্বকবি তাঁর কলমের এক আঁচড়ে তাকে চিরপ্রেমতৃষিতা করে রেখেছেন। তারা হোঁচপায় করতে চায়নি জীবনের কোন অপরিহার্য অঙ্গ-রূপে। তারা অভাব অনটনের ঠাঁটারপথে বিশ্বস্ত পদযাত্রা করেনি। স্বামীর, পিতার বা ভ্রাতার তার মোচনে ট্রামে-বাসে নিত্য অনন্তার সেই নারীর দেখা কবি পাননি। পুরুষের প্রেম ছিন্ন অন্য সার্থকতা যে তার আছে, সে যে সেই সার্থকতায় তৃপ্ত থাকতে পারে, প্রথমে ব্যক্তি হয়ে তবেই সে নারী হতে চায়, বিশিষ্ট রচনায় এমন চিত্র দুর্লভ।

অনন্তা বন্যা যাকে সৃষ্টি করে রবীন্দ্রনাথ নারীর নূতন বংশলতিকা সৃষ্টি করেছেন, বিবাহের চেয়ে প্রেম বড় যার দর্শন, সেও আলাপে কোন রাগিনী না হয়ে অর্কেস্ট্রার মিশ্রধ্বনি সৃষ্টি করে একটা মিল রেখেছে।

লাবণ্য বলেছে—"এক সময়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি নিতান্তই তরলো.....
আজ হঠাৎ দেখলুম আমিও ভালোবাসতে পারি.....মনে হয় এতদিন
তারা ছিলুম, এখন সত্য হয়েছি।" (লাবণ্য তর্কা 'শেষের কবিতা')

রবীন্দ্রনাথের নারী : সমার্থ প্রাপ্য, কাব্যপূজা নারীর জীবনে কি রস থাকেনা? ভালোবাসা কি শুধু একটি পুরুষের প্রতি বহমান হবে? সমাজ, রাষ্ট্র, জ্ঞান বা শিল্পসাহিত্যের প্রতি বিশুদ্ধ অনুরাগ কি 'জীবন যাপনের' পক্ষে যথেষ্ট নয়? ১টি বিদ্যালঙ্কার চ্যারেজ নাইটিঙ্গেল, সারদামণি, মাদাম কুরীদের জীবনও তো সার্থক জীবন।

গোকির 'মাদার' রবীন্দ্রসাহিত্যে শুধু লাবণ্যের হাতে দেখা দিয়েছে। ভাগ্য লাবণ্য প্রেমের পথে নিজের জীবনে গ্রহণ করল।

"যে আমারে দেখিবারে পায় অসীম অন্তরে
তাহারে মিলায়ে সকলি এবার পূজার তরে আপনারে দিতে চাই বলি।"

রবীন্দ্রনাথকে অনেক সময় বোঝা শক্ত। ব্যবহারিক জগতের বিচারে তাঁর বিচার চলে না। সে সম্পূর্ণ কবির সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথকে নারী কেন অশেষ মূল্য দেয়? কারণ নিজে তিনি নারীকে অফুরান মূল্য দিয়েছেন। এই বহুপরিচিতা পংক্তিগুলি তাঁরই দান—

"বলো যদি সরল সাহসে
বিদায় নাটক সুখ, নাহি সুখ বলে,
দেবতানী, তুমি শুধু দিবি মুক্তিমতী!
তোমাকেই করিনু বরণ—
নাহি ক্ষতি, নাহি কোন লজ্জা তাহে।
রমণী মন
সহস্র বন্ধেরি পাশা, সাধনার ধন।" ('বিদায় অভিশাপ')

রূপময়ী প্রেয়সী নারীর চিত্র যেমন কল্পনাতীত, জননী গৃহলক্ষ্মী মূর্তি প্রচুর রবীন্দ্রসাহিত্যে। বাল্যকালে কনিষ্ঠাদের চিত্রে, যৌবনমায়ার সেইকালের চিত্রে একই সুকোমল স্নেহশ্রীহিল্লোলিত সম্ভ্রম ও মূল্য আরোপ দেখা যায়। যথা—

বিভিমণি— অফুরাণ সান্ত্বনার খনি
ক্ষিপ্র হস্তক্ষেপ চারি দিকে শান্তি দেয় রোপে;
আশ্বাসের বাণী সুমধুর অবসাদ করি দেয় দূর।'

নারীর চিত্রের পাশেই নারবেদ্যে—

"অন্তরে তার যে মধুধারটী পুঞ্জিত সুপ্রকাশিত সুন্দর হাতে সন্দেশে।
লুব্ধ কবির চিত্ত গভীর গঞ্জিত মত্ত মধুপ মিষ্টি রসের পরেশে।"

('প্রধানিনী'—'নারবেদ্য')

রবীন্দ্রনাথের কাছে এত পেয়েছি যে লুব্ধ মন যেটুকু পায়নি সেটুকুও চেয়ে সম্পূর্ণ পায়নি কেন বলে তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অনন্তা আত্মমর্যাদাশালিনী বহু নারীকে সৃষ্টি করার জন্য কবিকে ধন্যবাদ।

(চন্দ্রকিরণবিহ্বল বৈশাখী দিনে, দু'টি গন্ধপরিসিক্ত শ্রাবণ সন্ধ্যায় বারবার রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করি, অবিরত মনে ভেসে আসে কত কত বিচিত্ররূপিনী নারীকে অনায়াসে তিনি সৃষ্টি করেছেন। উত্তরসূরী সশ্রদ্ধায় সেই সৃজনকে গ্রহণ করেছে, তবু নিরালা প্রহরে এখনও মনে কয়েকটি প্রশ্নের আবির্ভাব হয়। তাদের উত্তর আর কে দিতে পারবে?)

□

রবীন্দ্রনাথ ঃ ১৯৯৪

সুনীত বসু

এইখানে প্রতিদিন এঁটোপাতা
চেটে খায় লোলুপ মার্জার।
নিজের উঠোন ঝুড়ে টান আর জোগানের
চতুর খেলায় মাতা এই তো সময়!
ধর্মের আড়ায় যারা বন্ধ হানবে
মানদণ্ড থেকে আজ উঠে আসা চতুর মর্কট
তাদের সেখার অঙ্ক, তাই তারা
তলার কুড়োনো আর গাছের খাওয়ায়
হিসেবী অঙ্কের তাপে সেঁকে নেয়
সভ্যতির আপাদী জীবন-জোড়া
টিকিনের রুটি। আজ তারই মধ্যে বনস্পতি
তোমার ছায়ায় কারা মেতেছে কীর্তনে?
তবু এক উপলব্ধি? বক্তার আমিত্বে পড়ে টান।
ছোট হোক, আরও ছোট হোক যতো
তোমাকে জানার কথামালা।

যদির কানের কাছে বেজে যায়
গীতি-আলেখ্যের মতো মধুর মধুর ধ্বনিগুলি—
এর পর 'আত্রিত্তির' পালা শেষে
আমাদেরও নব্য সংযোজনে
প্রতিদিন নগর কীর্তন আর নৃত্যনাট্য হবে।

JATIYA SAMACHINTAN, MONTHLY, April-May 1984 Vol.-8 No. 8-9 Regn. No. 44065/E
Postal Regn. No. WB/HWH-4

The Librarian,
Central Library,
University of Calcutta,
CALCUTTA - 700 016.

Jatiya S...
97/3, Naskarpara Road,
Howrah-711 107

"খাদি জনতার সেবা করে—খাদি কিনুন"—গান্ধীজী

গান্ধী স্মারকনিধি, বাংলা

১৪, রিভারসাইড রোড, পোঃ অঃ—বারাকপুর, ২৪-পরগণা

খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন অনুমোদিত খাদিভবন থেকে সূতী-খাদি, সিল্ক-খাদি বস্ত্র এবং গ্রামোদ্যোগী জিনিষপত্র কিনে পল্লীবাংলার দরিদ্র কাটুনী ও অন্যান্য কারিগরদের অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন।

—: প্রতিষ্ঠান :—

গান্ধী স্মারকনিধি খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবনসমূহ

(১) ৮৯, এস. এন. ব্যানার্জী রোড,
চিড়িয়ামোড়, বারাকপুর,
২৪ পরগণা।

(২) ৩৮, অরবিন্দ রোড,
নৈহাটি,
২৪ পরগণা।

(৩) ৫৮, কে. এম. শা' ষ্ট্রীট,
শ্রীরামপুর, হুগলী।

(৪) সামন্ত বাজার
সিউড়ি

(৫) ৪৭/এ/৩, জি. টি. রোড,
কালীতলা, শ্রীরামপুর,
হুগলী।

(৬) ১১/১

(৭) জি. দাস বিল্ডিং
১২, রেল গেট
বারাসাত, জেলা-২৪পরগণা।

Jatiya Samachintan is published by Smt. Bhikha Sanyal from 97/3, Naskarpara Road, Howrah-711107 and Printed by her at Print Service, 91, Naskarpara Road, Howrah-711107

জাতীয় সমচিন্তন

লেখকসূচি

রাখাল চন্দ্র দে

রবীন্দ্র নাথ সমাদ্দার

সেনগুপ্ত

সুধাংশু কুমার চক্রবর্তী

শঙ্কর কুমার সাহানা

সেখ হাবিবুল হাসান

বর্তমান সংখ্যার রচনা ঃ

তথ্য পরিসংখ্যান ও মান বিবেক

ইন্দ্রনাথের ইস্টিশন

গোপন বার্তা

কৃষ্টি সংরক্ষণ

ভালবাসা

মারাত্মক দুর্ঘটনা আইন

মাসিক পত্রিকা □ অষ্টম বর্ষ □ একাদশ সংখ্যা

জুলাই ১৯৯৪ □ আষাঢ় ১৪০১ □ চার টাকা

'পরিবেশ রক্ষা করুন'

মানুষ খাবার ছাড়া বাঁচতে পারে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ, জল ছাড়া প্রায় পাঁচ দিন আর বাতাস ছাড়া মাত্র পাঁচ মিনিট। এই বাতাসেই থাকে অক্সিজেন। আর এই অক্সিজেনের মূল উৎসই হচ্ছে সবুজ উদ্ভিদ।

* * * * তাই বলি, গাছ লাগান, প্রাণ বাঁচান।

হরিজন সেবক সং৩, কুল অব ল্যাণ্ডস্কেপিং রিসার্চ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের যৌথভাবে প্রকাশিত ও ১৭/৩ নস্কর পাড়া রোড, হাওড়া-৭১১১০৭ হইতে প্রচারিত।

জনশিক্ষা সমীক্ষণ

মাসিক পত্রিকা অষ্টম বর্ষ ☐ একাদশ সংখ্যা ☐ চার টাকা

জুলাই ১৯৯৪ ☐ শ্রাবণ ১৪০১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

ভূবন ক্রান্তি দিবসে বাঁকুড়ার কুমারী মিহির বেলপাতে ☐ তীর্থ চৌধুরী

শুধা পরিসংখ্যান ও মান বিবেক ☐ রাখাল চন্দ্র দে

ইন্দ্রনাথের ইস্তিপত্র ☐ মনীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

গোপন ব্যাধা ☐ সাধনা সেনগুপ্তা

কৃষি সংরক্ষণ—সংরক্ষণশীল কৃষি ☐ সুধাংশু কুমার চক্রবর্তী

কবিতা : ভালবাসা ☐ সেখ হাবিবুল হাসান

মারাত্মক দুর্ঘটনা আইন ☐ শঙ্কর কুমার সাহাল

সংবাদবার্তা ☐ রাখাল চন্দ্র দাস

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ☐ ডঃ অর্ধেন্দু বিশ্বাস সহ-সম্পাদক ☐ পল্লব মিত্র

সম্পাদক ☐ শঙ্কর কুমার সাহাল প্রকাশিকা ☐ শিখা সাহাল

মুদ্রক ☐ সুনীল কুমার দে, প্রিন্ট সার্ভিস, ৩১ নস্কর পাড়া রোড, ঘুসুড়ী, হাওড়া-৭. ফোন : ৬৬৩-৬৬৭২

কার্য্যালয় ☐ ১৭/৩ নস্কর পাড়া রোড, ঘুসুড়ী, হাওড়া-৭১১ ১০৭ ☐ ফোন : ৬৬৩-৬১৬১, ৬৬৩-৬৬২১

শাখা কার্য্যালয় ☐ বেলগাছিয়া ভিলা, ব্লক-৮বি, ফ্ল্যাট-৬, কলিকাতা-৭০০০৩৭ ☐ ফোন : ৩৩৬-৩৩১১

ভূদান ক্রান্তি দিবসে বাঁকুড়ায় কুমারী নির্মলা দেশপাণ্ডে

তীর্থ প্রধান

১৮ই এপ্রিল বাঁকুড়া গান্ধীবিচার পরিষদের উদ্যোগে সারাদিন ব্যাপী কর্মসূচীর মাধ্যমে ভূদান ক্রান্তি দিবস পালন করা হয়। ১৯৫১ সনের এই দিনটিতেই আচার্য বিনোবা ভাবে ভূদান ও গ্রামদান আন্দোলনের সূত্রপাত হিসেবে প্রথম ভূদান গ্রহণ করেন তামিলনাড়ুর পচচমপল্লী গ্রামে। দাতা ছিলেন তথাকার অধিকারী শ্রীরাম রেড্ডী, যিনি দান করেন একশত একর জমি, বিতরিত হয় আশি জন ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে। তৎপরে সারাদেশ জুড়ে ভূদানের যে বৃহৎ কর্মযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, কালক্রমে বিমিত হয়ে আসে তার গতি। কিন্তু কিছু কিছু নিষ্ঠিত প্রয়াসের শলিমাটি রয়ে যায় সমাজদেহে। তাকে ভিত্তি করেই নূতন প্রচেষ্টার ঢেউ তুলেছে গান্ধী বিচার পরিষদ বাঁকুড়া জেলার গ্রামে গ্রামে, চাষীদের বিভিন্ন গ্রামে। আর এরূপ এক প্রচেষ্টা সম্বোজনীনে পর্যালোচনা করলেন বিনোবাজীর মানস কন্যা সর্বভারতীয় সংঘের নেত্রী সর্বভারতীয় হরিজন সেবক সংঘের সভানেত্রী কুমারী নির্মলা দেশপাণ্ডে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গী ছিলেন শ্রী শিবনাথ রায়।

বাঁকুড়ার অমর কানন সেবাদল আশ্রমের এক সভায় কুমারী নির্মলা দেশপাণ্ডে বলেন যে, বিনোবাজীর দশ বৎসর ব্যাপী পদযাত্রার সারা দেশে ৩৩৩ জেলায় সংগৃহীত হয় ৪৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৮৮৬ একর জমি। তার মধ্যে ১২ লক্ষ ৭৫ হাজার একর অযোগ্য জমি বাদ দিলেও আনুমানিক ৩০ লক্ষ ৮৬ হাজার ৮৮৬ একর জমি বিতরণ যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। কিন্তু উপযুক্ত সাংগঠনিক পরিকাঠামোর অভাবে সব জমি বিতরণ সম্ভব হয়ে ওঠে নি। কিছু কিছু পুরনো মালিকদের হাতেই রয়ে যায়। তাই তিনি সাংগঠনিক প্রস্তুতির উপর জোর দিয়ে বলেন যে বাঁকুড়া গান্ধী বিচার পরিষদের নেতৃত্বে একশতটি গ্রামকে কেন্দ্র করে গ্রাম স্বরাজের যে বলিষ্ঠ পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে তার সফলতা সারাদেশে আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করবে।

ভূদান ক্রান্তি দিবসের কর্মসূচী হিসাবে কুমারী দেশপাণ্ডে বাঁকুড়া জেলার ২০টি গ্রাম সফর করেন এবং তন্মধ্যে দুটি গ্রামে লোক সমিতির অধিবেশনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ১৮ই অপরাহ্নে গ্রামস্বরাজ কর্মী সম্মেলনে এবং ১৯শে অপরাহ্নে কালপাথর রামকৃষ্ণ আশ্রম ময়দানে এক বিরাট জনসভায় গ্রাম স্বরাজের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। শ্রীশিশির সান্যাল বাঁকুড়া জেলায় গান্ধী বিচার পরিষদের বহুমুখী কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেন। সভায় সর্বভারতীয় হরিজন সেবক সংঘের সম্পাদক শ্রীঅনারায়ণ বানার্জী এবং রাজ্যসংঘের সম্পাদক শ্রীশঙ্কর কুমার সান্যাল বাঁকুড়ার শ্রীশিশির সান্যালের নেতৃত্বে গ্রাম স্বরাজের পথে যে বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে তাকে অনন্য বলে উল্লেখ করেন।

২০শে এপ্রিল কুমারী নির্মলা দেশপাণ্ডে, শ্রীশিশির সান্যাল, শ্রীঅনারায়ণ বানার্জী ও শ্রীশঙ্কর কুমার সান্যাল খড়্গপুরে অনুষ্ঠিত মেদিনীপুর জেলা হরিজন সেবক সংঘের এক সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংঘের জেলা সভাপতি শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র মাইতি এবং স্বাগত ভাষণ দেন জেলা সম্পাদক শ্রীনরসিংহ চেট্টা এবং বক্তব্য রাখেন শ্রীঅনারায়ণ বানার্জী, শ্রীশঙ্কর কুমার সান্যাল, শ্রীতীর্থসেন বেহারা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংঘের তাম্রলী মুক্তি সংগঠক শ্রীবরেন্দ্র নাথ মাইতি।

আমাদের কথা

ধর্মীয় আবেগ ও একটি প্রাণ

একমাত্র মহাকালই অপরিবর্তনশীল এবং অবিনশ্বর। মহাকাল চলিয়া আসিতেছে, চলিতেছে এবং চলিতেই থাকিবে। ইহার আদি নাই, অন্ত নাই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর সবকিছুই নশ্বর ও পরিবর্তনশীল। সূর্য চিরকালই তাহার অফুরন্ত উত্তাপ লইয়া টিকিয়া থাকিবে না এবং পৃথিবী প্রথমে সূর্য হইতে একটি গ্যাসপিণ্ডরূপে ছিটকাইয়া আসিলেও, কালপ্রভাবে তাহা কঠিন বস্তুতে পরিণত হইয়া দীর্ঘকাল পরে জীবকুলকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিল। শ্যামলা পৃথিবী আরও কোটি কোটি বৎসর ধরিয়া আমাদিগকে লালন করিতে থাকিলেও তাহার নশ্বর দেহও একদিন বিনষ্ট হইবে এবং ব্রহ্মাণ্ড হইতে জীবকুলও নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

কোন্ সুদূর অতীতে প্রজ্ঞাবান ঋষি-কবি কুলের অনন্ত জ্ঞানের আকরে শাস্ত্রসমূহ রচিত হইয়াছিল আমরা কেহ তাহা জানি না; কিন্তু সেইসব শাস্ত্র-নির্দিষ্ট নিয়মনীতি সমূহ আমরা আবহমান কাল হইতে পালন করিয়া আসিতেছি। তাই বলিয়া এই নিয়মনীতিগুলিকে নিশ্চয়ই আমরা অবিনশ্বর বলিয়া মনে করিতে পারি না। আবার নানা মনীষী ও পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিবর্গ যারা সমাজ-জীবনে সুপ্রোথিত শাস্ত্রনীতিসমূহ পরিবর্তন সাধনও করিয়াছে শুধু তাহাই নহে সমাজকালে আরও কত শাস্ত্রনীতির আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই নিজস্ব ধর্মানুশাসিত শাস্ত্রনীতি রহিয়াছে এবং নিজ নিজ শাস্ত্রে অবিচলিত শ্রদ্ধাবান থাকিয়া তদ্দেশীয় অধিবাসীবর্গ তাহাদের জীবনবেদ গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে। যদিও জনজীবনে এই সকল ধর্মীয় শাস্ত্রসমূহের সুস্থিত প্রভাব অতি দীর্ঘস্থায়ী, তবুও এইগুলির অবিনশ্বরতা কেহই স্বীকার করিবে না। মহাকালের গতি প্রভাবে জীবজগতে অতি সূক্ষ্মভাবে নিত্যই পরিবর্তন সাধিত হইতেছে এবং ইহার ফলেই আমাদিগের পূর্বপুরুষ বানর প্রজাতির বংশধারায় প্রবাহিত স্রোতের অনুকূলে আমরা মনুষ্যরূপে বিবর্তিত হইয়াছি।

এই পৃথিবীর সকলধর্মীয় সম্প্রদায়ের মতই মুসলমান সম্প্রদায়ের যে শাস্ত্রীয় গ্রন্থ কোরাণ নামে পরিচিত, পৃথিবীর সকল মুসলমানই তাহার প্রতি অনুরক্ত ও ধারবদ্ধ। তাহাদের এই জীবনবেদ তাহাদের নিজ নিজ জীবন অপেক্ষাও বহুগুণ মূল্যবান—এই কথা স্বীকার করিয়া লইয়াই বলা যায়, পৃথিবীর কোন ধর্মীয় শাস্ত্রের সবকিছুই সবসময়ে সবদেশোপযোগী নাও হ'তে পারে। জীবনের ধর্মই যখন পরিবর্তনশীল, তখন জীবন সম্পৃক্ত সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থও এ সম্বন্ধে সচেতন এবং দেশে দেশে যুগে যুগে এমন অসংখ্য ধর্মসংস্কারক মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, যাঁহারা পর্বতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম করিয়া ধর্মসংস্কারের কাজ করিয়া গিয়াছেন।

সুতরাং যুগপরিবর্তন তথা জীবন ও সমাজ পরিবর্তনের সহিত সমতা রক্ষা মানসে বাংলাদেশের এক নবীনা লেখিকা যদি তদীয় ধর্মশাস্ত্র কোরানের কোনো কোনো পরিচ্ছদের পরিবর্তনের সপক্ষে নিজস্ব ও শক্তিশালী মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতে কোন দোষ থাকিতে পারে না। বিশেষ করিয়া অধিকারহীনা অন্তরালবাসিনী নারীদের অধিকার অর্জনের অভিপ্রায় তাঁহার এই নিঃসরণ মত প্রকাশের জন্য বরং তিনি অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।

জীবনের অগ্রগতির সারসত্যকে অস্বীকার করিয়া সেই দেশের গোঁড়া মৌলবাদীরা তাঁহার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে তদ্দেশীয় সরকারও তেমন উচ্চবাচ্য করিতেছেনা, বুদ্ধিজীবীরাও সাধারণ জনগণও তেমনি মৌলবাদী দস্যুদের বিরুদ্ধে তেমন প্রতিবাদী হইয়া উঠিতেছেনা। হইতে পারে, বয়সে নবীনা বলিয়া লেখিকার বক্তব্য কিছু পরিমাণে স্থূলতা প্রকাশ পাইয়াছে, আত্মপরিমার্জনেরও অবকাশ রহিয়াছে তবুও প্রগতিবাদী জীবন সম্পর্কে তাঁহার সুদৃঢ় মত প্রকাশকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায়না। তাঁহার বক্তব্যের সমালোচনা হইতে পারে, এমন কি প্রয়োজনবোধে তাঁহাকে উপদেশও দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহার জীবনকে লইয়া টানাটানি অন্যায় নিশ্চয়ই। কেহ যদি সত্যই অপরাধ করিয়া থাকে, তাহার বিচারের জন্য আইন আছে; এবং তাহাকে বৃহত্তর বেষ্টনীর মধ্যে বাংলা দেশের বিশেষ এক সম্প্রদায় কিভাবে সরব হইয়া উঠে, তাহা ভাবিবার বিষয়। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মগ্রন্থই মানুষকে ভালোবাসিবার এবং সেই মানুষের সমস্ত প্রকাশের অধিকারকে প্রচার করিয়া আসিতেছে—এই কথা মনে রাখিয়া বলা যায় উক্ত মৌলবাদীরা অমানবোচিত ও অধিকার বহির্ভূত এইরূপ মতামতের দান করিয়া ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থ শাস্ত্রকেই অপমান করিতেছে। হইতে পারে সেই দেশটি ইসলামী ধর্মানুমত দেশ, কিন্তু সেই ধর্মের নির্দেশানুসারেই সেই দেশের সরকার এইসব ভণ্ড ধর্মানুরাগী কালাপাহাড়ী রক্তবীজের দলকে কঠোর হস্তে দমন করিয়া প্রাণ ভয়ে ভীতা আত্মগোপনকারিণী সম্ভাবনাময়ী লেখিকা নারীটির প্রাণরক্ষার বিষয়ে কৃতনিশ্চয় সংকল্পে কেনই যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেনা তাহা গভীর রহস্যে নিহিত।

আমরা একান্তভাবে তাঁহার মুক্তজীবন কামনা করিতেছি।

তথ্য পরিসংখ্যান ও মান বিবেক

রাখাল চন্দ্র দে

পৃথিবীর এই ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে অনুসন্ধান চালালে দেখা যাবে যে জীব মাত্রেই একে অপরকে খেয়ে বাঁচে। ব্যাপারটা এক প্রত্যক্ষ এবং সর্বকালীন ঘটনা। একে অস্বীকার করার উপায় নেই। তথ্য পরিসংখ্যান সবই এর সাক্ষী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনুষ্য সমাজে আজ তা নীতি হিসাবে স্বীকৃতি পায়নি। মানুষের অন্তরের উপলব্ধি আছে। অহিংসাকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়ে আসছে।

তথ্য ও পরিসংখ্যান প্রত্যক্ষ এবং সদ্যপ্রাপ্ত। কিন্তু উপলব্ধিটা তা নয়। ওটা সময় ও চেষ্টা সাপেক্ষ। ওটা মনোমন্থন থেকে আসে। তথ্য প্রমাণাদি দ্বারা দেখানো যাবে যে যারা মাংস খায় তাদের শরীর অধিক পুষ্ট ও বলবান। সেই অনুপাতে নিরামিষ ভোজী দুর্বল ও ক্ষীণকায়। কথাটা আপাতঃ সত্য। আসলে কিন্তু উল্টোটাই সত্য। মাংসাহারীর যে বল সেটা হচ্ছে পেশীর বল। কিন্তু নিরামিষ ভোজীর পেশী দুর্বল হলেও মানসিক দৃঢ়তা—ধৈর্য, স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা, বিচার-শক্তি মাংসাহারীর চেয়ে অনেক বেশী। ফলমূলাহারী মানবের মানসিক স্থৈর্য ও সাহসের কাছে দুর্ধর্ষ পেশীবলশালী রত্নাকরকে হার মানতে হয়েছিল।

মহাত্মা গান্ধী একবার সোদপুর এসেছিলেন (৪০ কি ৪১ সনে)। সেদিন যুবসমাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের কর্মসূচী ছিল। কথা প্রসঙ্গে গান্ধীজী তাদের বললেন—"দেখো, তুম অপর মেরে সাথ পঞ্জা লড়নে আওগে তো মার হার জাউ। লেকিন মেরে সাথ সত্যাগ্রহে আওগে তো তুমহে হার যানা হোগা"। তাৎপর্য এই যে কেবল শারীরিক বলদ্বারা কোন বড় মহৎ কাজ সম্পন্ন হয়না। কাজেই সবল দুর্বল শুধু পেশীবল দিয়ে বিচার করা যায় না। পেশীবলে হিরণ্য কশিপুরের কোন জুড়িই ছিল না। কিন্তু অসহায় শিশু প্রহ্লাদের মনোবলের কাছে তাকে শুধু হারই মানতে হয়নি, তাকে ধ্বংস হতে হয়েছিল।

এখনকার বিজ্ঞান মানসিকতার মানুষ তিনটি শক্তির উপর নির্ভর করে চলে। তা হোল, পেশীশক্তি, যন্ত্রশক্তি আর অর্থশক্তি। এদের আধার হোল তথ্য ও পরিসংখ্যান। বিবেকশক্তি এখানে কাজ করেনা। তাই আজ সারা পৃথিবী এক মরণ-সঙ্কটের সম্মুখীন। তাই আজকের মানুষকে বিকল্প পথের খোঁজে নামতেই হচ্ছে। যে বিকল্প কারো পছন্দ অপছন্দের অপেক্ষা রাখেনা। কারণ পথ মাত্র দুটিই। মৃত্যু না হয় অমৃত্ব। মৃত্যুকে এড়াতে হলে অমৃত্বকে আশ্রয় করতেই হবে।

আজ মানব বিবেক পরিস্থিতির চাপে যতই দুর্বল হোক না কেন সেই পরিস্থিতির চাপেই তাকে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। রত্নাকরের মা, বাবা, স্ত্রী এবং আত্মীয়েরা তার পাপার্জিত অন্ন খেয়েও শেষ পর্যন্ত তার পাপের ভাগ নিতে রাজী হয়নি। আজকের বিশ্বের মানুষ এই বিবেক বর্জিত ত্রি-শক্তির (যন্ত্র, অর্থ ও পেশীশক্তি) উপর নির্ভর করতে বাধ্য হলেও তারা আজকের এই ত্রি-শক্তি সম্বলিত দানবীয় সভ্যতাকে ধিক্কার দিতে শুরু করেছে। বাইরের প্রচণ্ড বিজয়ও অনেক সময় বিবেকের কাছে গ্লানিকর হয়ে ওঠে। অশোকের কলিঙ্গ বিজয় কালে তার নিকট অতিশয় পরাজয়ের গ্লানি বয়ে এনেছিল।

আজকের মানুষ তার অতুলনীয় বৈজ্ঞানিক সাফল্যের মধ্যেও এক অতি মূর্খ-সুলভ ধারণা পোষণ করে আসছে। যে মনে করে যে বাহ্য সম্পদের প্রাচুর্যই তার অন্ত সম্পদকে উদ্বুদ্ধ ও পুষ্ট করে তুলবে। অন্তঃ সম্পদকে পুষ্ট করতে পারে কেবল মাত্র আত্ম-সম্পদই। বস্তু সম্পদ নয়। এই আত্ম-সম্পদকে উদ্বুদ্ধ না করতে পারলে তার কণ্টাজিত সমস্ত বাহ্য সম্পদই তাকে কবরে সমাহিত করে ছাড়বে।

তথ্য ও পরিসংখ্যান মানুষের মনে এক তরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারে মাত্র। কিন্তু সেই তরঙ্গ মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে—অনুকূলে না প্রতিকূল তা তথ্য পরিসংখ্যান বলে দিতে পারবে না। পারবে তার মানসিকতা। নাথুরাম গডসে যে গান্ধীকে হত্যা করেছে এটা এক ফ্যাক্ট। কিন্তু ঐ ঘটনা সকলের মনে একরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি। ভারতের এক বড় দলই উল্লাসিত হয়েছিল। পৃথিবীর সাধারণ মানুষ মর্মাহত হয়েছিল। আবার পাকিস্তানীরা হয়ত মুখটিপে হেসেছে। কিন্তু এসব প্রতিক্রিয়া ঐ তথ্য বা ফ্যাক্ট প্রকাশ করবে না। করবে যার যার মানসিকতাই। সুতরাং মানুষের সমস্ত ব্যাপারে তথ্য ও পরিসংখ্যানের গুরুত্ব ততটা নয় যতই বিভিন্ন স্বার্থ-রঞ্জিত মানসিকতার।

এ থেকে এটা একেবারে হিরক-স্বচ্ছ হয়ে ওঠে যে মানুষের সমাজ পরিবর্তনে বা রাষ্ট্র পরিচালনায় তথ্য ও পরিসংখ্যানের স্থানটি গৌন। মানসিক শুদ্ধতা, পরিণীত বিচার বুদ্ধিই মুখ্য। হিন্দু মুসলমানেরা যদি ইংরেজ পরিবেশিত বিকৃত তথ্যের উপর নির্ভর না করে নিজের মানসিকতাকে শুদ্ধ রাখার চেষ্টা করত (অন্ততঃ বেদ কোরানের সম্মানে) তা হলে ভারত বিভাগের এই বুভুক্ষু রাক্ষসটা জন্ম নিতে পারতো না—যা আজ উভয়েরই রক্ত ভোজনে তৎপর।

তথ্য জন্ম নেওয়া মাত্রই বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। নেতাজী সুভাষের বিমান দুর্ঘটনা একটা অমিসাংসিত তথ্য। কিন্তু তিনি জীবিত কি মৃত fact-finding তার কোন মিমাংসা করতে আজ পর্যন্ত অক্ষম। এসব অভিজ্ঞতা নিয়ে আমাদের আর একবার (হয়ত শেষ বারের মত) ভেবে দেখা আবশ্যক যে কার উপর নির্ভর করে আমরা আমাদের ভাবী সমাজ গড়ব। ফ্যাক্ট ফাইণ্ডিংয়ে না আত্মানুসন্ধানে?

মানুষ দৈহিক 'পাওয়া' টাকে যত গুরুত্ব দেয় আত্মিক "হওয়া" টাকে তত নয়। পাওয়ার কার কত অধিকার এ বিচার নিয়ে আজ আমরা ধ্বংসের মুখে এসে পড়েছি। এই পাওয়ার অধিকার বিচার একমাত্র সার্বিক ধ্বংসেই করতে পারে। কিন্তু হৃদয়কে মুক্ত করতে পারলে সবই থাকলো।

হাত পেতে অনেক কিছু নেওয়া যায়। কিন্তু তাতে হৃদয় গঠিত হয় না। মহৎ হওয়া যায় না। মহৎ হতে হলে চাই হৃদয়ের উপলব্ধি যা মানুষকে তার সমস্ত পাওয়াকে হওয়ার কাজে লাগিয়ে সমৃদ্ধ করে গড়ে তুলতে পারে। অন্যথায় উভয়েই পরস্পর ঘাতক হয়ে দাঁড়াবে। অর্থাৎ পাওয়া তার হওয়াকে নাশ করবে, আর হওয়া ও ব্যর্থ হয়ে পাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলবে।

ইন্দ্রনাথের ইষ্টিপত্র

মনীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

উনাশি বছরের জ্ঞানবৃদ্ধ, যুক্তিবাদী ও জনপ্রিয় ইন্দ্রনাথ চৌধুরীকে আমি 'ইন্দ্রনাথদা' বলেই সম্বোধন করতাম। এই সম্বোধনেই ইন্দ্রনাথ চৌধুরী পাড়াতে সুপরিচিত। তিনি ছিলেন একাধিক সভা-সমিতির সভাপতি। পাড়ার ছোট ছেলেমেয়েরা দিনের বেলায় যেদা ব'লে বলত "দাদ্বিদাদু" এবং সন্ধ্যার পর তিনি তাঁদের কাছে হতেন "টর্চদাদু"। বলাবাহুল্য সন্ধ্যাবেলায় বৃদ্ধ ইন্দ্রনাথ হাতে একটি ছোট টর্চও নিতেন। বছর দুই হল ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। এই দুই বছরে তিনি আমার ঘনিষ্ঠ হিতৈষী হয়ে উঠেছিলেন। আপদে-বিপদে সাংসারিক ও পারিবারিক সমস্যা নিয়ে ছুটতাম তাঁর কাছে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও উপদেশ লাভ করতে। মাঝেমাঝে তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এমন কি ধর্মীয় বিষয় নিয়েও আলোচনার সুযোগ পেতাম। আমি ছিলাম ইন্দ্রনাথ-দার চেয়ে দশ বছরের ছোট। তবুও মনে হত তিনি যেন আমার চেয়ে বেশী কর্মঠ এবং কর্মচঞ্চল।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁর পড়ার ঘরে নিরোধের জন্য প্রশ্ন ক'রে বসলাম—ইন্দ্রনাথদা, আপনি উইল করিয়ে রেখেছেন? তিনি গম্ভীর হ'য়ে উত্তর দিলেন—না। এখনো প্রয়োজন অনুভব করিনি। আমি বললাম—দু'বছর আগেই আমি কিন্তু একটা উইল করিয়ে রেখেছি কলকাতার এক অভিজ্ঞ উকিলের পরামর্শ নিয়ে। দিনকাল যা হয়েছে। সন্তানদের কার মতিগতি কখন কোন দিকে যায়, কে বলতে পারে।

আমার কথা শুনে ইন্দ্রনাথদা বললেন—তুমি ঠিকই করেছ ভবতোষ। কলকাতায় এবং এই দিল্লী শহরে তোমার বিষয় সম্পত্তি আছে। তুমি ঠিকই করেছ। তুমি বিচক্ষণ ব্যক্তি। উইলের কথা আমি কখনো চিন্তা করিনি। উইলের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা সে নিয়ে চিন্তাও করিনি। তবে এই মুহূর্তে তোমার প্রশ্ন শুনে আমার একটি উইল বা ইষ্টিপত্র রচনা করা উচিত। উকিল-মোক্তারের সাহায্য না নিয়েই একটি উইল রচনা করব।

এরপর প্রায় ছয়মাস কেটে গেল। মাঝে মাঝে ইন্দ্রনাথ-দার সঙ্গে পথেঘাটে দেখা হয়। হঠাৎ একদিন শুনতে পেলাম ইন্দ্রনাথ চৌধুরী হৃদরোগে মারা গেছেন। বিনা মেঘে বজ্রপাত। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে ইন্দ্রনাথদা আর নেই। তাঁর সন্তানেরা টেবিলে-রাখা কাগজ-পত্তরের মধ্যে একটি উইল খুঁজে পেয়েছে। আমি তাঁর স্নেহভাজন ছিলাম এই মনে করে ইন্দ্রনাথদার এক পুত্র আমাকে উইলটি পড়তে দেয়। কোনরূপ ভূমিকা না করেই আমরা ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর ইষ্টিপত্র উদ্ধৃত করছি।

আমার ইষ্টিপত্র বা উইল

আমি শ্রীইন্দ্রনাথ চৌধুরী সজ্ঞানে এবং সুস্থ দেহ মনে এই ইষ্টিপত্র রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

আমার বয়স এখন উনাশি। একদিন মৃত্যু মৃত্যু সম্বন্ধে আমি চিন্তিত ছিলাম না। প্রস্ফুটে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে—ছোটবেলা থেকেই কথাটি শুনে আসছি। চারবার আমি

মৃত্যুকে দিল্লীর লক্ষ্মরঞ্জন হাসপাতালে ফাঁকি দিয়েছি। শুধু তাই নয়। বিরানিশের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে গোপনে যোগদান করে ইংরেজকে কতখানি ভারত ছাড়তে বাধ্য করেছিলাম; তা বলতে পারি না। তবে আমাকে আমার দেহ ছেড়েই চলে যেতে হত। নিতান্ত ভাগ্য ভাল। যমরাজ হতাশ হ'য়ে তখন ফিরে গিয়েছিলেন। এবার যদি মৃত্যু এসে দাঁড়ায় আর তাকে ফাঁকি দেওয়া যাবেনা। সুতরাং এই সুন্দরী বিপুলা পৃথিবী থেকে চিরকালের মতো বিদায় নিয়ে চির অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার আগে আমি আমার কয়েকটি অন্তিম ইচ্ছা এই ইচ্ছিপত্রে ব্যক্ত করে রেখে যেতে চাই

সাধারণতঃ ইচ্ছিপত্র বা উইল বলতে আমরা যা বুঝি আমার এই ইচ্ছিপত্র বা উইল্ সেই অর্থে উইল্ বা ইচ্ছিপত্র নয়। উইলে দাতার বিষয় সম্পত্তি ভোগাদির ব্যবস্থা রক্ষিত থাকে। দাতার মৃত্যুর পর সেই ব্যবস্থা আইনসঙ্গতভাবে বলবৎ নয়। বর্তমানে আমার নিজস্ব এমন কিছু স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি নেই যার জন্য আমাকে উকিল মোক্তারের সাহায্য নিয়ে রেজেষ্ট্রি অফিসের দফিলা মিটিয়ে বাজারাতের দকল সত্ত্ব করে উইল্ করাতে হবে। সিতিকেট যাকে পেনসনের কিছু টাকা সঞ্চিত আছে। বলাবাহুল্য আমার মৃত্যুর পর সে টাকা আমার সহধর্মিনী পাবেন। যদি আমার পূর্বেই তিনি দেহত্যাগ করেন তবে আমার সন্তানেরাই তা ভাগ করবে। আমার চার পুত্র ও এক কন্যা। সকলেই বিবাহিত। সকলেই শিক্ষিত, উপার্জনশীল এবং প্রতিষ্ঠিত। সকলেই নিজস্ব সংসার-চক্রে আবদ্ধ। সকলেই পিতামাতার উপর সহানুভূতিশীল। বিপদে-আপদে সকলেই সাধ্যমত সাহায্য করতে পিছু-পা নয়। আমার এই বাড়ি সকলের সাহায্যেই নির্মিত। সুতরাং প্রশ্ন উঠবে-আমি ইচ্ছিপত্র রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি কেন? আমার এই ইচ্ছিপত্র বঙ্কিমের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' অথবা শরৎচন্দ্রের 'বৈকুণ্ঠের উইল' জাতীয় উইল্ নয়। এই উইল্ সর্বোতভাবে আমার উইল —একক এবং তুলনাহীন। আমি জানি আমার এ উইল বা ইচ্ছিপত্র পাঠ ক'রে গোঁড়া হিন্দু—আজ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন কিন্তু—অনেক বিরূপ সমালোচনা করবেন। তাঁদের সবাইকে আমি জানিয়ে রাখি আমি ধর্মহীন কোন দৈত্য নই। চিরকালের মানব ধর্মই আমার ধর্ম—নিত্যকালের মানুষের ধর্ম—যে ধর্ম বিজ্ঞানকে কোলে তুলে নেয়; প্রাকৃতিক রহস্য উদঘাটনের জন্য জানতে ও জানাতে চায়। আমার হিন্দুধর্মে কুসংস্কারের স্থান নেই। আমার হিন্দুধর্ম বিবেকচালিত পথেই চলতে সাহায্য করে। আমি এতকাল যে হিন্দু ধর্ম বিশ্বাস করে এসেছি, সে ধর্ম পুরোহিত উচ্চারিত কতগুলি অর্থহীন দুর্বোধ্য মন্ত্র নয় অথবা অর্থহীন আচারের বোঝা নয়। আমার হিন্দু-ধর্মে সকল ধর্মের স্থান আছে। আমার হিন্দুধর্মে রক্তপিপাসু দানবের স্থান নেই। যে ধর্ম সাধারণ মানুষকে ইহজগতের সর্বসুখবঞ্চিত ক'রে কল্পিত স্বর্গসুখের ছবি দেখায় আমি সে জাতীয় ধর্ম ও কুসংস্কারে আদৌ বিশ্বাস করিনা। 'বেঁচে থাকি, বেঁচে থাকো'—আমার ধর্ম আমাকে এই মূল শিক্ষা দেয়। কারণ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নেই।

এইবার অতি সংক্ষেপে এই ইচ্ছিপত্রে আমার কয়েকটি অন্তিম ইচ্ছা লিপিবদ্ধ করে যাই।

(১) আমার মৃতদেহ সংকার আমার মৃতদেহ সংকার ব্যাপারটি যেন ব্যয়বহুল ও আড়ম্বরপূর্ণ ঘটনা না হয়। নিকটবর্তী কোন শ্মশানে বা বৈদ্যুতিক চুল্লীতে সমবাহ ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় এবং যুক্তিসঙ্গত মনে করি। [এই ইচ্ছিপত্রের সঙ্গে একটি খামে এক হাজার টাকা সঞ্চয় করে রেখেছি। আমার মৃতদেহ সংকারে যেন এই টাকা ব্যয় করতে কেহ কুণ্ঠিত না হয়।]

(২) মৃতদেহ সংকারের সঙ্গে মুখাগ্নি ব্যাপারটি জড়িত। মৃতদেহ সংকারকালে শবের মুখে স্পর্শ করাবার জন্য যে অগ্নি ব্যবহার করা হয়, তাহাই 'মুখাগ্নি'। এটি একটি সংস্কার মাত্র। আমার যে কোন সন্তান বা নিকটতম কোন আত্মীয়ের মুখাগ্নি দিবার অধিকার আছে। যদি কোন সন্তান কোন কারণে আমার শবের মুখে অগ্নি স্পর্শ করাতে অনিচ্ছুক হয়, তবে সামাজিক অন্য কোন চাপ সৃষ্টি করে তাকে বাধ্য করা যুক্তি সঙ্গত হবে না। তাইকে মুখাগ্নি দিতে বাধ্য করাকে আমি অপরাধ বলে মনে করি। মুখাগ্নি ব্যাপারটি একটি বিশ্রী এবং বিতৎস সংস্কার মাত্র। বৈদ্যুতিক চুল্লীতে আমার মৃতদেহ দাহ করবার ব্যবস্থা করলে মুখাগ্নি দিবার ব্যাপারটি আর থাকবে না। বৈদ্যুতিক চুল্লীতে বিদ্যুৎ বহ্নি শবের মুখসহ সর্বাঙ্গই একসঙ্গে ভস্মীভূত করবে।

(৩) আমার শ্রাদ্ধ—মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা সহকারে যে অনুষ্ঠান করা হয়, সাধারণতঃ আমরা তাকে 'শ্রাদ্ধ' বলি। অনেকে এই ব্যাপারটিকে পিতৃকৃত্যও বলে। শ্রাদ্ধকালে পিতৃদেবের নামোল্লেখ পূর্বক একই মন্ত্রের পুনঃপুনঃ আবৃত্তি অপ্রীতিকর এবং অনাবশ্যক বলে আমি মনে করি।

শ্রাদ্ধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরো তিনটি অর্থহীন কুসংস্কার। এই তিনটি বিষয় হল—শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ, শ্রাদ্ধশান্তি ও পিণ্ডদান। অনেক সময় পুরোহিতের উপদেশে মরণাপন্ন মানুষের প্রায়শ্চিত্ত করেও অর্থ অপচয় করা হয়ে থাকে। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে চোষ্য চোষ্য ভোজন করিয়ে মৃতের প্রতি কতটুকু শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়, তা আজও আমি বুঝে উঠতে পারি নি। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে ভোজন করানো আমি আদৌ সমর্থন করি না।

শ্রাদ্ধশান্তি কি? প্রেতকৃত্য ও মৃতের আত্মার শান্তিকামনা করাকেই শ্রাদ্ধশান্তি বলে। পিণ্ডদান একটি নিষ্প্রয়োজনীয় অর্থহীন কুসংস্কার মাত্র। পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত গোলাকার খাদ্যসামগ্রীর গ্রাসকে বলে 'পিণ্ড'। শ্রাদ্ধে মন্ত্রপূত অন্নপিণ্ডদানই 'পিণ্ডদান'। এই জাতীয় লোকাচার বা দেশাচার সম্পূর্ণরূপে যুক্তিহীন ও অর্থহীন কুসংস্কার মাত্র। পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হবার পর আমার আত্মা কি শান্তি লাভের আশায় সহাবোধে ভেসে বেড়াবে? এমন বিশ্বাস আমার নেই। বিশ্বসৃষ্টির পর থেকেই আজ পর্যন্ত যত কোটি মানুষ বন্যা ঘাতা, মহামারী অগ্ন্যুৎপাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, শান্তি ও অশান্তিতে, ধর্মীয়কলহে হত্যায় ও আত্মহত্যায় মারা গেছে, তাদের আত্মার যে গতি হয়েছে, আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মার ঐ একই গতি হবে। কারণ মৃত্যুর পর সাম্যসংস্থাপক প্রকৃতি ও মহাকাল একই নিয়মে সকলের গতি একইভাবে নির্ধারণ করে রেখেছে। প্রকৃতির কাছে মানব-মহামানব সাধু-সন্ন্যাসী, গৃহী, শিশু-যুবা বৃদ্ধ, তরুণ-তরুণী জাত-জাতী, বিদ্যমান অথবা নিঃস্বের কোন ভেদাভেদ নেই। মৃত্যুর পর মানুষ বেঁচে থাকে জীবিত মানুষের মনে। যার অমর স্থান, প্রেমের আসনে প্রতিষ্ঠিত, যিনি বিজ্ঞানের সাধনায়, মানুষের কল্যাণে, প্রকৃতি রহস্য উদ্‌ঘাটনে উৎসর্গীকৃত, তিনিই অমর তিনিই জীবিত মানুষের মনে অমর হ'য়ে থাকেন। তবুও মহাপ্রকৃতি ও মহাকালের কাছে কোন কিছুই অমর নয়। কারণ মানুষের মনে দুটি ক্রিয়া সর্বক্ষণ চলেছে—সৃষ্টি ও বিস্মৃতি। মহাকাল কোন মানুষকে অনন্তকাল বাঁচিয়ে রাখেনা গ্রহ-উপগ্রহেরও বিনাশ ঘটে, নবনব গ্রহতারকা দেখা দেয়। আমার সমস্ত জীবনে আমি শুধু মন, বুদ্ধি ও বিবেক—এই তিনটিকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছি। এই তিনটিকে যে মানুষ যত অনুশীলন করেছে, সে-মানুষ জীবনে তত বেশী প্রস্ফুটিত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, যেখানে দেহ নেই, সেখানে প্রাণ নেই; যেখানে প্রাণ ও দেহ নেই, সেখানে মন, বুদ্ধি ও বিবেক বলে কিছু নেই—যেখানে সমাজ নেই, সংসার নেই, নীতি নেই, দুর্নীতি নেই, ভালমন্দ কিছু নেই। তাই আমার একান্ত অনুরোধ

'আমার মৃত্যুর পর আমার আত্মার শান্তি সম্বন্ধে কেউ যেন বিচলিত না হন। যাঁরা জীবিত অবস্থায় স্বার্থপ্রণোদিত হ'য়ে আমার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে দু পয়সা লুটেপুটে নিয়েছেন, জীবিত অবস্থায় আমাকে রোগে-শোকে সাহায্যের জন্য মৌখিক সহানুভূতিও জানান নি, তাঁরা কেউ যেন আমার মৃত্যুর পর কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করতে আমাদের বাসায় না আসেন। কৃত্রিম অশ্রুপাত অপেক্ষা মৃত্যুতে যাঁরা প্রকৃত শোকার্ত হবেন তাঁরা যেন একত্রে মিলিত হ'য়ে একদিন মহা প্রকৃতির কোন একটি রূপ কল্পনা করে উপাসনা করেন, আর আমার ভালমন্দ দিকগুলি কিছু-ক্ষণের জন্য আলোচনা করেন। এটাই হবে আমার প্রকৃত শ্রাদ্ধ।

(৪) আমার সহধর্মিণীর প্রতি—স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারীকে নানা প্রকার অত্যাচার ও অসম্মানের বোঝা বইতে হয়। সমাজ তার উপর নানাপ্রকার বাধানিষেধের তর্জনী প্রদর্শন করে। এগুলি সাধারণতঃ বিধবা-নারীর অশন বসন ভূষণ সংক্রান্ত। তাছাড়া অমাবস্যা একাদশী ও পূর্ণিমা ব্রত পালনই অদিতে উপবাস আদি লেগেই থাকে। কোন আনন্দ অনুষ্ঠানে বিধবা নারীকে অবহেলা করতে দেখা যায়। এইসব সামাজিক ও পারিবারিক আচরণ মহা অপরাধ। অশন বসন ভূষণ ইত্যাদি অধিকাংশই আপেক্ষিক, রুচি ও শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। স্বামীর মৃত্যু হলেই যে বিধবা নারী পৃথিবীর সর্বসুখবঞ্চিতা হবে এমন নিষ্ঠুর প্রথা আমি সমর্থন করি না। আমি জীবনে অনেক অল্পবয়স্কা বিধবা তরুণীর ক্রন্দন শুনেছি, বয়স্কা বিধবা নারীর বেদনার কথা জানি, বিধবা বৃদ্ধার চোখের জল দেখেছি, বেদনার কথা শুনেছি। সুতরাং আমার মৃত্যুর পর আমার বিধবা পত্নীর উপর অশন, বসন ও ভূষণের উপর কোন বাধা নিষেধ থাকবেনা। অমাবস্যা, পূর্ণিমা অথবা একাদশীর ব্রত উদ্‌যাপন বা উপবাস স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় এবং তা সধবা-বিধবা এবং নারীপুরুষ সকলের জন্য প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

(৫) আমার সন্তানদের প্রতি—আমার মৃত্যুর পর শোক প্রকাশের জন্য মস্তক মুণ্ডন অবশ্য কর্তব্য নয়, অন্ততঃ আমি তা মনে করি না। মস্তক মুণ্ডন শোক প্রকাশের একমাত্র লক্ষণ কিনা তা আমার জানা নেই। প্রিয়জন মৃত্যুজনিত ব্যাথা অন্তরের ব্যাপার—মনের ব্যাপার। মানুষের দুঃখ বেদনা শোক, চোখের জল, প্রাণের শূন্যতা বোধ, হাহাকার পরবিপনীর সজ্জিত দ্রব্য সম্ভার নয়। আমার সন্তানেরা মিলিত প্রচেষ্টায় দিল্লীর কোন বিদ্যালয়ের একটি উপযুক্ত ছাত্র ও ছাত্রীর এক বছরের বেতন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়, তবে আমার প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা প্রদর্শন হবে। তাতেই হবে—কিছুকালের জন্য আমার স্মৃতিরক্ষা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস চার পুত্র আমার এই ইচ্ছা মৃত্যুর পর পূর্ণ করবে। এটি একটি প্রকৃত সৎকর্ম বলেই গণ্য হবে। আমার কন্যা সঙ্গীতশিল্পী। আমি আশা করি আমার কন্যা অন্ততঃ বছরাসের জন্য একটি উপযুক্ত মেয়েকে বিনা বেতনে সঙ্গীত শিক্ষা দান করবে।

(৬) আমার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার—আমার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ ও পুস্তিকা আছে। আমার তৃতীয় পুত্র গ্রন্থপ্রিয়তার সাহিত্য প্রেমিক। আমি আশা করি আমার তৃতীয় পুত্র আমার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারের গ্রন্থসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ হাসি মুখে গ্রহণ করবে।

(৭) শুভানুধ্যায়ী ও বান্ধবীদের প্রতি—আমার আন্তরিক স্নেহ আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা ছাড়া আমার এমন কিছু নেই যে এই উইলপত্রে বিশেষ করে উল্লেখ করি। তাদের জন্য আমার আশীর্বাদ রেখে গেলাম।

আমি নানা সুযোগ ও দুর্যোগের মধ্য দিয়ে বড় হয়েছি, অভাবের যন্ত্রনা সহ্য করেছি, প্রাচুর্যের ছবি দেখেছি। জীবনে বহু জ্ঞানী-গুণীজনের সান্নিধ্য লাভ করেছি, সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গে ভারতবর্ষের অনেক তীর্থস্থান দর্শন করেছি—তারাপীঠ থেকে বদরীকাশ্রম। যতদূর সম্ভব সভা সমিতি পরিচালনাকালে সভাপতি হিসাবে নিরপেক্ষ থেকেছি। সত্যকে যতদূর সম্ভব ধরে রেখেছি। এই কারণে কেহ কেহ আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আজ এই চিঠিপত্র রচনাকালে তাদের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা জানাই।

শ্রী ভক্তনাথদার চিঠিপত্রটি পাঠ করে কিছু নীরব হ'য়ে রইলাম। নিজের মনেই বললাম—ভক্তনাথদা, তোমাকে আমরা কেউ বুঝতে পারি নি।

সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামের সম্পদই ভারতবর্ষের জাতীয় সম্পদের বৃহত্তর অংশ। গুটিকয় মহানগরীর জৌলুস তার ভগ্নাংশ মাত্র। গ্রামের মানুষের কর্মনিযুক্তির মাধ্যমে আমরা সেই সম্পদ সৃষ্টির কাজে নিরলস প্রয়াসী।

তাই, গ্রামের উৎপাদন বেশী করে কিনে দেশের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করুন।

চন্দ্রকান্ত ললিতমোহন রেশম খাদি প্রতিষ্ঠান

(খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন কর্তৃক প্রমাণিত)

বহরমপুর, (পোঃ খাগড়া, জেঃ মুর্শিদাবাদ (পঃ বঃ)

ফোন : BHB-(০৩৪৮১) ২০১০৮ গ্রাম : 'CHANDAKAN

(সীতাভবন নিরন্তিত বাজার)

কলকাতায় আমাদের বিক্রয় ভাণ্ডার :

খাদি সিল্ক এম্পোরিয়াম

১নং সেক্সপীয়ার সরণি, কলিকাতা-৭০০ ০৭১

ফোন : ২৪২-১৯১৮ / ৪৭৩-৬০৩৭

গোপন ব্যাথা

সাধনা সেনগুপ্তা

শীতকালে আকাশ যদি গোমড়া মুখ করে থাকে তবে কি ভাল লাগে। শ্যামলী জানালা দিয়ে অনমনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল, যতদূর চোখ যায়—আকাশের সীমা ছাড়িয়ে দূরে—আরও দূরে। এখন শীতের দুপুর। অন্য দিন এ রকম শীতের দুপুরে সে রোদে পিঠ দিয়ে বসে 'উল' বোনে বা কাগজ বা কোন বই পড়ে। আজ রোদ নেই, কিছুই ভাল লাগছে না। মন ভাল না লাগা দিনে তার কবিতা পড়তে ভাল লাগে। জীবনানন্দ শ্যামলীর প্রিয় কবি। শ্যামলী উঠে সযত্নে রক্ষিত 'বনলতা সেন' খানা নিয়ে এল। কয়েকটি পাতা উল্টাতেই বইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল অনেক দিনের পুরোনো বিবর্ণ একখানা খাম যার উপরে খুব সুন্দর করে তারই নাম—কুমারী কালের উপাধিসহ শ্যামলী সেন লেখা। মন বুঝি হাওয়ার চেয়েও জোরে ছোটে; আর স্মৃতির 'এ্যালবামে' বুঝি সব ছবিই ধরা থাকে। এই চিঠির স্মৃতি তার কাছে যেন কচি ঘাসের মতই তাজা সবুজ যেন কেবল গত কালেরই ঘটনা। অতীতের কথা চিন্তা করতে লাগল শ্যামলী। এ চিঠি যখন তার কাছে এসেছিল তখন সে পনের বছরের কিশোরী। মাত্র একটি চিঠিই সে পেয়েছিল পত্র লেখকের কাছ থেকে। চিঠির উত্তর শ্যামলী দেয় নি, দেওয়া সম্ভব ছিল না, ছিল না ইচ্ছাও। অথচ চিঠিটা সে নষ্ট করেনি, বরং কত বৎসর হয়ে গেল এখনও তার কাছে গোপনে, সযত্নে আছে চিঠিখানা কতবার ভেবেছে পুড়িয়ে ফেলবে, কিন্তু পারে নি। কি যেন একটা মায়া।

তখন দেশ ভাগ হয়নি। শ্যামলীর বাবার আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গে, অধুনা বাংলাদেশে। তিনি ছিলেন উচ্চপদে আসীন সরকারী কর্মচারী। কর্মসূত্রে পশ্চিম ও উত্তর ভারতে ঘুরতে হত। তিনি ছিলেন আধুনিক মনোভাবাপন্ন। দেশের বাড়ীতে স্ত্রী ও সন্তানদের না রেখে তাঁদের তাঁর কর্মস্থানেই রাখতেন। শ্যামলী তাঁর একমাত্র কন্যা এবং বড় আদরের। শ্যামলীর তখন বছর পনের বয়স। একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে তারা সকলে দেশের বাড়ীতে গেল এবং কয়েক সপ্তাহ ছিলও সেখানে। পশ্চিমে বড় হয়েছে বলেই হোক আর ইংরেজী মাধ্যমে পড়াশুনা করত বলেই হোক, গ্রামের প্রতিবেশীরা শ্যামলীকে নিয়ে তেমন একটা মাতামাতি করেন নি। নিকট আত্মীয়জনেরাও না। শ্যামলী তাই খুব একটা মেলামেশার সুযোগ পায় নি। পনের বছর আজকালকার মেয়েদের পক্ষে কিছুই না। কিন্তু তখনকার দিনে পনের কেন তারও পূর্বে মেয়েদের বিবাহ হওয়ার প্রচলন ছিল। শ্যামলীর বাবা শ্যামলীকে কলেজ শিক্ষান্তে বিবাহ দেবেন স্থির করে রেখেছিলেন। শ্যামলী তখনও স্কুলের গণ্ডি পার হয়নি। শ্যামলী স্কুলের ছাত্রী ছিল বটে তার বন্ধু-বান্ধবী স্কুলের পরিধির বাইরেও ছিল। এদের সঙ্গে পত্র বিতালীর কথা শ্যামলীর পিতা মাতার অজানা ছিল না। এ বিষয়ে তাদের কোন অস্বাভাবিক কৌতূহলও ছিল না কোন দিন। শ্যামলীর কোন পত্র গোপনে পড়া তো দূরের কথা, ঐ বিষয়ে কোন দিন কোন প্রশ্নও করেন নি তারা। তাই এই পত্রখানাও শ্যামলীর কাছে আসে স্বাভাবিক ভাবেই অন্যের কৌতূহল না জাগিয়ে। চিঠিটা ছিল কিন্তু শ্যামলীর কাছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, কারণ পত্র লেখকের সঙ্গে তার পরিচয়ই ছিল না বলা চলে। তবুও চিঠিখানা নষ্ট করার মত প্রবৃত্তি হয়নি বলে আজও সযত্নে রাখা আছে, আজও চিঠিখানা পড়লে তার মনের

ভেতর কেমন যেন একটা অনুভূতি আসে। চিঠিখানা অপ্রত্যাশিত ছিল কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল না। চিঠির বক্তব্য ও চিঠির প্রেরক দুই-ই সে দিন শ্যামলীর মনে এনেছিল এক প্রচণ্ড ঝড়। আজও সে দিনের কথা তার মনে শিহরণ জাগায়। এই চিঠি পাওয়ার পূর্বে সে অনেকের কাছ থেকে অনেক পত্র পেয়েছে। কিন্তু এই চিঠিখানা ছিল সম্পূর্ণ নূতন এক অনাস্বাদিত স্বাদের। সেই স্মৃতি তাই আজও অম্লান। সেই স্মৃতি আজও ব্যথা দেয় মনে; আজও মধুর বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের তুলনায় শ্যামলীরা ছিল অনেক বেশী আবেগপ্রবণ। তাই চিঠিখানা আজও শ্যামলীর এক মূল্যবান সম্পদ, সযত্নে রক্ষিত সম্পদ, মূল্যবান গোপন সম্পদ যা কিনা তার স্বামীরও অজানা। চিঠিটা তাকে লেখা এই পর্যন্ত। এই লেখার বিষয়ে এছাড়া তার কোন সম্পর্কই ছিল না। চিঠির প্রাপ্তি স্বীকারও সে কোন দিন করেনি। আজ এই পরিণত বয়সে তার স্বামী সন্তান নিয়ে সুখের সংসারে এ চিঠির কোন মূল্যই নেই। হঠাৎ করে আজকের কেউ যদি সে স্বামীই হোক, চিঠিখানা পড়ে কিন্তু অস্বাভাবিক ধারণা তাদের হবে না। যে বয়সের ঐ পত্র সে বয়সে শ্যামলীর মত সুন্দরী মেয়েদের ঐ রকম দু চার খানা পত্র পাওয়াটা স্বাভাবিক। সে দিন কিন্তু শ্যামলী ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকত। তার অবশ্য অনেক স্বাধীনতা ছিল সে দিন। তবুও কেমন যেন একটা অপরাধ বোধ তার মনকে ভরে রাখত সব সময়। অথচ ঐ চিঠি প্রাপ্তির আনন্দও তাকে কোন সুখ দেয়নি। চিঠিখানা ছিল অমূল্য সাম্রাজ্যের ধন এক মালিক। শ্যামলী আজ জানে না পত্রপ্রেরক কোথায়। সেও নিশ্চয়ই জানে না শ্যামলী আজ কোথায়। দৈনকটা কোন দিনই ছিল না। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে দূরত্ব যেন সাগরের। সাগরের দুই কূলে দুই জন। তবুও চিঠিখানা আজও যখন সে পড়ে এবং সেই সুদূর অতীতের কথা মনে পড়ে তখন পুরান দিনের সেই আনন্দের আস্বাদ নূতন করে অনুভব করে। চিঠিখানা হাতে নিয়ে কিছু সময় চুপ করে বসে থাকল শ্যামলী। কবিতা পাঠে আর ইচ্ছা নেই। কিন্তু পরে আস্তে আস্তে চিঠিখানা, শতবার পড়া চিঠিখানা খুলে আবার পড়তে লাগল।

তোমাকে কি বলে সম্বোধন করবো জানি না। সম্বোধন আমার মনের মণিকোঠায় সযত্নে রেখে দিলাম। পার যদি অনুমান করে নিও।

এক দিন সকালে বাইরের ঘরে বসে পড়া-শুনা করছিলাম। হঠাৎ দেখি আমাদের বাড়ীর ঠিক উল্টো দিকে একখানা ভাড়া গাড়ী থামল। গাড়ী থেকে নামলেন এক ভদ্রলোক। সঙ্গে এক কিশোরী অর্থাৎ তুমি। তোমাকে দেখে চমকে উঠলাম। মনে হল তুমি আমার কত পরিচিত; যেন তোমারই আসার আশায় বসে ছিলাম এত দিন।

তোমার বাবা মা ঘরে ঢুকলেন, তুমি বাইরে। যে বাড়ীতে তোমরা এসেছিলে অর্থাৎ তোমার বাবা বাড়ীর সম্মুখে একটা ছোট কিন্তু সুন্দর ফুল বাগান ছিল। বাগানে নানা প্রকার গাছের মধ্যে ছিল একটা বকুল গাছ। তুমি ঘরে ঢুকবার পূর্বে ঐ গাছের তলায় বিছানো অসংখ্য ফুলের মধ্য থেকে কিছু ফুল আঁচলে তুলে নিলে। তোমার মুখে একটা তৃপ্তি একটা আনন্দের আভাস। আনন্দ উছল তুমি তখন তোমার কাল হরিণ চোখে একবার চারি দিক দেখে নিলে। তোমায় অজান্তে লুকিয়ে তোমাকে দেখছিলাম। তোমার কাজল কালো চোখ, তোমার দীর্ঘ কেশরাশি তোমার শ্যামল রং সব মিলিয়ে আমার মনে এক নেশা ধরে গেল।

বেশীদিন তোমরা থাকো নি। প্রতিবেশী হিসাবে তোমার বাবার সঙ্গে সামান্য পরিচয় যে হয় নি তা নয়। মনের গোপন ইচ্ছা ছিল তোমার সঙ্গে আলাপ করবার। কিন্তু সম্ভব হয় নি। কারণ তুমি আর পাঁচজনের মত সাধারণ ছিলে না। নিজ ব্যক্তিত্ব নিয়ে দূরে দূরে থাকতে। তোমার মাকেতো তাই বোনদের সঙ্গে আলাপে তোমার বাবার সঙ্গে কথাবার্তায় তোমাদের বিষয় অনেক জেনেছি। তুমি অবশ্য মাঝে মাঝে তোমাদের ফুল বাগানে বেড়াতে, কখনও অন্য কার সঙ্গে, —কখনও একা। তোমার শাড়ী, তোমার বিলাতী পোষাক তোমার পশ্চিমের শালওয়ার ইত্যাদি আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি আর মুগ্ধ হয়েছি। যে পোষাকেই তুমি বাইরে আসতে সেই পোষাকেই তোমাকে মানাত। কি অপূর্ব লাগত তোমাকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পোষাকে। ভেবেছি অনেক সময় নিজে উপযাচক হয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করি। কিন্তু সুযোগ যখন আসত তখন নিজেকে গুটিয়ে নিতাম। তোমার সঙ্গে আলাপ করা খুব অসম্ভব ছিল না। তোমার মনে কি প্রতিক্রিয়া হবে ভেবে আর অগ্রসর হই নি। যদিও তখন এবং এখনও তুমি আমার হৃদয়রাণী।

প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে তোমার উদাসীনতা আর আমার সংকোচ যে আমাদের পরিচয়ের একমাত্র বাধা ছিল তা নয়। অলঙ্ঘ্য বাধা ছিল অন্যত্র। বাধা আমাদের ধর্ম। আমি জানতাম, তুমিও জান, তোমার আমার সম্পর্ক কোন দিনই নিবিড় হতে পারত না—কারণ ঐ ধর্মের প্রাচীর। আমি অবশ্য এখনও জানি না একই ধর্মের হলেও তুমি আমাকে কোন প্রকার প্রশ্রয় আদৌ দিতে কি না। কিন্তু তুমি গ্রহণ করতে কি প্রত্যাখ্যান করতে সেটা আমার কাছে বড় নয়। তোমাকে আমার মনের কথা বলে আমার হৃদয়কে হালকা করার সুযোগ আজ নিলাম বলে নিজেকে অপরাধী মনে করছি। আমি ত' তোমার মন জানি না। তোমার কাছে প্রতিদান ও সুখের কথা এই পত্রের উত্তরও প্রত্যাশা করাও হয়ত আমার পক্ষে বাতুলতা। জীবনে হয়ত। আর কোন দিন দেখা হবে না। যদি হয়ও তবে আমাকে চিনবে কি করে। তুমিত আমাকে খেয়ালিই কর নি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তোমার স্মৃতি আমার মনে সবুজ ও তাজা থাকবে। অতি দূর থেকে তোমার জন্য সুখ ও শান্তি কামনা করব এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে শেষ করি। আজ আর নাম গোপন নয়।

ইতি—
কাজী আব্দুল

এইবার নিয়ে হাজার বার চিঠিখানি পড়ল জামলী। ও জানে না কোন দিন এই চিঠির কথা, এই চিঠির প্রেরকের কথা কাউকে বলে বুকের ভার লাঘব করতে পারবে কিনা। ওত আবদুলকে চিনতই না। যতদিন যাচ্ছে চিঠিখানার মূল্য যেন ততই বাড়ছে। জবাব ত' দেওয়া হল না। সম্ভবও নয়। নিজেকে অপরাধী বোধ হয়—ওর নিজেরই কাছে।

কৃষি সংরক্ষণ—সংরক্ষণশীল কৃষি

সুধাংশু কুমার চক্রবর্তী

ভারতের কৃষি এক নূতন মোড়ের মুখে। ঔপনিবেশিক শাসকরা কৃষির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও প্রাধান্যকতা দিতেন তাঁদের দেশের নতুন শিল্প বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল উৎপাদনের ওপর। ফলে ভারতে চিরন্তন অন্নাভাব। স্বাধীনতার পর প্রথম দ্বিতীয় যোজনার পরিত্যক্ত ও অ-কর্ষিত জমি চাষের আওতায় আনার এবং উন্নততর পরিচালনার ফলে ফসলের উৎপাদন বেড়েছিল। কিন্তু ১৯৬৫-র ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের পর আমেরিকা থেকে পি. এল. ৪৮০ প্রোগ্রামে গম আসা বন্ধ হওয়ার পর ভারতে আবার অন্নাভাব দেখা দিল। সেই সময় বিদেশ থেকে এল অধিক ফলনশীল ধান ও গমের বীজ-সেচ ও রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে এই বীজের উৎপাদন অনেক গুণ বাড়া সম্ভব। এল নবুজ বিপ্লব নানা শস্য উৎপাদন ১৯৬০-৬১-তে আট কোটি কুড়ি লক্ষ টন থেকে বেড়ে ১৯৮১-৯০-তে সত্তর কোটি তিরিশ লক্ষ টন হল। দেশ খাদ্যে স্বয়ম্ভর হল।

নবুজ বিপ্লবের সফলতা ভারতবাসীর চোখ ধাঁধিয়ে দিল ফলে নূতন কৃষি পদ্ধতির কুফল ও অসঙ্গতিগুলি তাদের চোখ এড়িয়ে গেল। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভুল হল—কৃষির বাণিজ্যকরণ—কৃষি ছিল কৃষকের জীবনধারার অঙ্গ তাকে পরিবর্তিত করা হল অর্থ উপার্জনের উপাধানে। জমি ও পরিবেশ সংরক্ষণকে উপেক্ষা করে জোর দেওয়া হল জমি থেকে কত কম সময়ে কত বেশী লাভ করা যায় তার ওপর।

দ্বিতীয় ভুলটি আরও মারাত্মক যদিও এটি প্রথম ভুলের কুফল প্রসূত। বাণিজ্যভিত্তিক ফসল উৎপাদনে ecology বাস্তুবিদ্যার বা জমি পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হল না। মানুষ ভুলে গেল ফসলের ক্ষেতে চলে বিচিত্র জীবন লীলা—পুষ্টিকর খাদ্য সঙ্কালন, শিকারী ও শিকারের মধ্যে প্রতিক্রিয়া, যার ফলে ঘটে ক্রমিক পরিবর্তন। বহু হাজার বছরে কৃষকেরা বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পরিবেশের ওপর যত কম সম্ভব চাপ সৃষ্টি করে যে ফসল চক্র উদ্ভাবন করেছিল তাকে ট্র্যাডিশনাল অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে পরিবর্তে গৃহীত হল সেচ। অধিক রাসায়নিক সার কীট নাশকের ঔষধ প্রয়োগ করে অধিকফলনশীল এক ফসলের চাষ, ফলে পরিবেশ দূষিত হতে লাগল। Times of U.S A. ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯১-তে প্রকাশিত Lost Times, Lost Knowledge এর বিশেষ উল্লেখ করা হল।

তৃতীয়তঃ নবুজ বিপ্লবের সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব অধিক ফলনশীল বীজের জন্য পরিমিত সেচের প্রয়োজন দেশের কৃষিযোগ্য জমির মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ সেচের সুবিধা আছে বাকি ৭০ ভাগ অসিঞ্চিত। চেষ্টা ও অর্থব্যয় করেও শতকরা ৪০ ভাগ জমিতে কোনও না কোনও উপায়ে সেচের বন্দোবস্ত করা সম্ভব হলেও বাকি জমি অসিঞ্চিত থেকে যাবে—এই জমির অধিকাংশই আদিবাসী, হরিজন ও অন্যান্য দরিদ্রশ্রেণীর—ফলে গ্রামে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বাড়ছে ও বাড়বে।

চতুর্থতঃ দেশের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ কৃষি নির্ভর হলেও কৃষি ও কৃষকরা আজও তাদের যথার্থ মর্যাদা পায়নি—সিদ্ধিতদের কাছে কৃষকরা চাষা ও রাজনৈতিক মহলে ভোট ব্যাঙ্ক। ফলে ধনী কৃষকরা প্রশ্রয় পাচ্ছেন—কৃষি প্রায় করমুক্ত উপহার সার ও অন্যান্য কৃষির উপাদান ও ফসলের ওপর ভর্তুকীর সিংহভাগ তাঁরাই পাচ্ছেন, অন্যদিকে ঝড়ে, জলে, রোদে, বৃষ্টিতে যে কৃষি শ্রমিকদের নিপুণ হাত আমাদের অন্ন জোগান দিচ্ছে তারা অসংগঠিত শ্রমিক শিল্প শ্রমিকদের তুলনায় তাদের দিন মজুরী অনেক কম এবং অধিকাংশ সময় তারা তাও পান না। আমূল ভূমি সংস্কার নিয়ে অনেক কথা বলা হয়। পশ্চিম বাংলায় বর্গাদারদের নাম নথীভুক্ত করার কাজ প্রশংসনীয় হলেও যথাবর্তী সত্ত্ব বিলোপ করা হয়নি। ভূমিহীনদের জমি তাদের মর্যাদা দিলেও জমির যথাযথ ব্যবহারের দান ও আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য জমির উপযুক্ত ব্যবহার হয় না এবং ভূমিহীনেরা তাদের শ্রমের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পান না। অধিকাংশ জমিই নিম্নমানের যে জমিতে ঘাস বা ঘাস লাগান উচিত সেখানে ধান বা অন্য ফসল নেওয়ার চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না এবং জমিরও অবক্ষয় হয়।

অধিকফলনশীল বীজ, সেচ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করে যে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি গড়ে উঠেছে তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্নগুলি নিয়ে শুধু বিতর্কই চলছে না বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে এই পদ্ধতির বিকল্পের অনুসন্ধানও চলছে। জাপানী কৃষি বৈজ্ঞানিক মাসানোবু ফুকুওকা 'Natural Farming' বা 'প্রাকৃতিক চাষের' পদ্ধতি প্রবর্তন করার সুপারিশ করেছেন তিনি ভূমি বন্টন, আগাছা নিবারণে কর্ষণ বা রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ, রাসায়নিক সারের বা কীটনাশক ঔষধের ব্যবহারের বিরোধী ১৯৬০ ও ১৯৭০ দশকে পরিবেশ সচেতনতা আন্দোলনের প্রভাব কৃষিক্ষেত্রেও পড়ে। কৃষক ও কৃষিবৈজ্ঞানিকরাও নূতন করে চিন্তা করতে লাগলেন। কৃষকেরা দশ হাজার বছরে যে কৃষি পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন সেগুলিকে ট্রাডিশনাল অবৈজ্ঞানিক আখ্যা দিয়ে সম্পূর্ণ বর্জন করা কি যুক্তিসঙ্গত? বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা ভুল ভ্রান্তির নিরসনের পর ট্রাডিশনাল কৃষি পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল তা জীব পরিবেশ সংরক্ষণের অনুকূলে ছিল কি না—ফিরে দেখা আরম্ভ হল।

'State of the world' ১৯৮৭-তে প্রকাশিত 'Sustaining world Agriculture প্রবন্ধে Lesler R. Brown বলেছেন অত্যাধিক কর্ষণের ফলে সোভিয়েট ইউনিয়ন, চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রে (United States-এ) কিভাবে ফসলের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের 'Virgin Lands' প্রকল্প রূপায়ণের ফলে সোভিয়েতের শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্র প্রায় শতকরা ১২ অংশ কমে যায়। মাও-সে-তুংয়ের 'অধিক শস্য উৎপাদনের' প্রকাশিতের ফলে ১৯৮৫ সালে চীনে উৎপাদনের ক্ষেত্রে শতকরা ১ প্রতিশত কমে যায়। যুক্তরাষ্ট্রে তৃণভূমি কর্ষণের ফলে প্রায় ৪০ মিলিয়ন হেক্টর ভূমিতে আবার ঘাস বা ঘাস লাগান হয়। তাঁর মতে এই শতকের শেষ অবধি পৃথিবীর শস্য ক্ষেত্রের পরিধি মোটেই বাড়বে না।

উপলব্ধ পরিসংখ্যান অনুসারে ভারতে স্বাধীনতার পর কর্ষিত ভূমির পরিমাণ ১১১ মিলিয়ন হেক্টর থেকে বেড়ে ১৪১ হেক্টর হয়েছে অর্থাৎ বৃদ্ধির পরিমাণ ২৩·৬ শতাংশ এর একটা বড় অংশ প্রান্তিক ভূমি যা গোচারণ বা বন সৃজনের উপযুক্ত। ভারতে কর্ষণ যোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব নয় বরং কর্ষিত প্রান্তিক জমি গোচারণ বা বনসৃজনের কাজে লাগানো প্রয়োজন। ভারতের বহু গ্রামের গোচারণ ভূমি সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। গ্রামের কিছু প্রান্তিক জমিতে ঘাস ও গাছ লাগান প্রয়োজন।

আধুনিক কৃষিতে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার বহু বিতর্কিত আগেই বলেছি। জাপানী কৃষি বৈজ্ঞানিক মিঃ ফুকুওকা কৃষিতে কোনও রাসায়নিক সার, কীটনাশক বা অগাছা নিবারণ ঔষধ ব্যবহারের বিপক্ষে। ইউরোপ ও আমেরিকার কিছু সংখ্যক প্রগতিশীল কৃষক রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করছেন। রাসায়নিক কীটনাশকের পরিবর্তে মিশ্র চাষ, উপযুক্ত ফসল চক্র প্রবর্তন এবং জৈবিক পদ্ধতিতে পোকা মাকড় ও রোগ দমনের ওপর জোর দিচ্ছেন। চীন ও ভারতে কর্ষিত জমি প্রায় সম পরিমাণ এবং উভয় দেশে রাসায়নিক সার প্রয়োগের পরিমাণ প্রায় ১১ মিলিয়ন মেট্রিক টন। চীনে প্রায় ২২ মিলিয়ন টন জৈব সার ব্যবহার করা হয়—ভারতে ব্যবহৃত জৈব সারের পরিমাণ উপলব্ধ করা সম্ভব হয়নি। ভারতে প্রায় ১৭০ মিলিয়ন টন দানা শস্য উৎপাদিত হয়—চীনে হয় ৩০০ মিলিয়ন টন অবশ্য খোসা (husk) সমেত। খোসা বাদ দিলেও চীনের শস্য ফলন ভারতের তুলনায় অনেক বেশী।

State of the world 1987. 'Sustaining world Agriculture' প্রবন্ধে ১৯৫০ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত দানা শস্য উৎপাদন ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের তুলনামূলক হার থেকে দেখা যায় ১৯৫০এ যেখানে রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে সারের অনুপাতে ৪৬ গুণ বেশী ফসল উৎপাদন হত ৮০-র দশকে এই পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩ গুণ মাত্র। ১৯৫০ থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত পৃথিবীতে সারের ব্যবহার বছরে ১১ প্রতিশত হারে বেড়ে যাচ্ছিল কিন্তু ১৯৮৪ থেকে ১৯৮৮-তে এই হার কমে ২ প্রতি শতে দাঁড়িয়েছে।

সিঞ্চিত জমিতে শুধু একাধিক ফসল উৎপাদন করাই সম্ভব নয়—সেচের সাহায্যে ধরা বা অনিয়মিত বর্ষণের ফলে ফসলের ক্ষতি বাঁচান সম্ভব। বর্তমানে ভারতের মাত্র সত্তরকরা ৩০ ভাগ কর্ষিত জমি সেচের আওতায় পড়ে। ভারতের কৃষি বিকাশ এখনও পর্যন্ত সিঞ্চিতক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। দেশের ১৯ কোটি ২০ লক্ষ হেক্টর জমিতে যে ফসল হয় তার ৭০ প্রতিশত অর্থাৎ প্রায় ১০ কোটি ২০ লক্ষ হেক্টর বর্ষা নির্ভর। অথচ ডাল, তুলা, চীনাবাদাম, তৈলবীজ, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা অধিকাংশে ডালই এবং অধিকাংশে পশুখাদ্যও অসিঞ্চিত জমিতেই উৎপাদন করা হয়। সেচের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে সিঞ্চিত ক্ষেত্রের কৃষকরা সেচ ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে জমি থেকে দুটি বা তিনটি ফসল নেওয়ার চেষ্টা করছেন। অনিয়মিত সেচ ও রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে জমির অবক্ষয় হচ্ছে—জমি সারা বছরে কখনও বিশ্রাম পাচ্ছে না, ফলে প্রাকৃতিক নিয়মে জমি কিছু পরিমাণেও উর্বরাশক্তি ফিরে পাওয়ার অবকাশ পাচ্ছে না। ইউরোপ বা আমেরিকার আমাদের তুলনায় সার অনেক বেশী দেওয়া হয় কিন্তু সাধারণতঃ জমি থেকে একটি ফসলই নেওয়া হয় ফলে জমি যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর মালিকদের ভর্তুকী দিয়ে কিছু জমি চাষ না করে পতিত রাখা হয়—ফলে জমি উর্বরা শক্তি ফিরে পাওয়ার অবসর পায়। পশ্চিম বাংলায় সিঞ্চিত জমিতে ব্যাপকভাবে বোরো ধানের চাষ হচ্ছে। বোরো ধানের ফলন অনেক বেশী, লাভও বেশী, কিন্তু জলের প্রয়োজন অনেক বেশী। সেচের জন্য কাছাকাছি অনেক নলকূপ বসানোর ফলে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমে যাচ্ছে এবং পানীয় জলের স্রোতও হ্রাস পাচ্ছে। নলকূপ খননের ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। কয়েকজনের ব্যক্তিগত স্বার্থে সাধারণ মানুষদের কষ্ট পেতে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে গমের ফলন খুবই খুবই ভাল—গমে জলের প্রয়োজন অনেক কম—উপরন্তু সেচের জলে অনেক বেশী গম উৎপন্ন করা সম্ভব হত কিন্তু বোরো ধান লাগান যেমন বাড়ছে—গমের উৎপাদন ক্রমশঃ কমছে। আমন ধানের পর বোরো ধান চাষ করার ফলে ফসল চক্র ব্যাহত হচ্ছে, কীট পতঙ্গের বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে এবং কীট-নাশক ঔষধের প্রয়োগও বাড়ছে। ফলে পরিবেশ দূষণও বাড়ছে।

অধিকফলনশীল বীজ সবুজ বিপ্লবের মুখ্য উপাদান। এই বীজ, উপযুক্ত পরিমাণ সেচের সাহায্যে অধিক পরিমাণ সার গ্রহণ করে বেশী ফলন দিতে পারে। ব্যাপকভাবে অধিকফলনশীল বীজ ব্যবহারের প্রচারের ফলে দেশীয় বীজ ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে এসেছে। প্রকৃতি বৈচিত্র চায়—সীমিত সংখ্যক উচ্চফলনশীল বীজের ব্যবহারের ফলে কীট পতঙ্গের সংখ্যা বাড়ছে—বাড়ছে রাসায়নিকের ব্যবহার—পরিবেশ দূষণ।

ভারতে রোগ ও কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার কম হলেও এর কুফল শুধু কৃষকরাই নন সাধারণ মানুষও বুঝতে পারছেন। ফসলের রোগ নিরোধক ও কীটনাশক ঔষধ বিষ এবং অনেক ফসলে এই বিষের অবশিষ্টাংশ—মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক। এই ঔষধ কেবলমাত্র ফসলের ক্ষতিকারক কীট পতঙ্গই বিনাশ করে না—মাটির ও ফসলের সহায়ক জীব জগতেরও প্রচুর ক্ষতি করে। বৃষ্টির বা সেচের জলের সঙ্গে কিছু পরিমাণ ঔষধ নদী বা পুকুরে পড়ে এবং মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের প্রচুর ক্ষতি করে। কৃষি বৈজ্ঞানিকরা রোগ প্রতিরোধক বীজের ব্যবহার ও জীব বিজ্ঞানের সাহায্যে কীট পতঙ্গ দমনের ওপর অধিক গুরুত্ব দিচ্ছেন। বহু বৎসরের অভিজ্ঞতায় কৃষকেরা যে মিশ্র চাষ পদ্ধতি ও ফসল চক্র গ্রহণ করেছিল তার ফলে কীট পতঙ্গের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু আজ এ সব প্রথা বিলুপ্ত প্রায়।

কৃষির রক্ষণশীলতা জমির উপযুক্ত ব্যবহারের ওপরও নির্ভর করে। অধিক ফলনের জন্য কৃষির অযোগ্য পতিত জমিতে নানা শস্য চাষ করা হচ্ছে—ফলনও কম হচ্ছে এবং জমির অবক্ষয়ও বাড়ছে। পতিত জমিতে বাঁশ বা গাছ লাগালে জমির অবক্ষয় কমবে। জমি তার উর্বরতা ফিরে পাবে—রাস্তা পশুখাদ্যের অভাব কমবে—পশুপালনে অধিক কর্মসংস্থান সম্ভব হবে। সম্ভব হবে শিশুদের নিয়মিত দুধ সরবরাহ করা।

মাটি, জল, হাওয়া দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। জন সংখ্যা বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য বিকাশশীল দেশগুলি বাণিজ্যভিত্তিক আধুনিক কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করল প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয় ও দূষণ থেকে চলেছে—এর কুফল 'গ্রীণ হাউস ইফেক্ট' বা 'ওজন স্তরে গহ্বর' সৃষ্টির চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক। মানুষকে সচেতন করা ও সংরক্ষণশীল কৃষি পদ্ধতি সম্বন্ধে অন্বেষণ ও গবেষণার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। মনে রাখা দরকার যেভাবে সবুজ বিপ্লবের জোয়ার এসেছিল সে ভাবে বল্প সময়ে মানুষকে তার পরিবেশ সচেতন কৃষি পদ্ধতি পুনঃগ্রহণ করান সম্ভব নয় এবং বাঞ্ছনীয়ও নয়। দেশের জনসংখ্যা বাড়ছে তাদের মুখে অন্ন যোগাতে হবে—কৃষকের জোতের পরিমাণ কমছে তার আয়ও বাড়াতে হবে। কৃষিকে শিল্পের মর্যাদা দেওয়া সম্বন্ধে দাবী তোলা হচ্ছে। যাঁরা এই আন্দোলনের সমর্থন করেন তাঁদের অধিকাংশই নিজের হাতে চাষ করেন না—করলে বুঝতে পারতেন কৃষি জীবন শিল্প—কৃষকরা জাত শিল্পী। মনে রাখা দরকার দেশের মাত্র পঞ্চকরা ৩০ ভাগ কৃষি জমি সেচের আওতায় পড়ে। বাকী ৭০ ভাগ জমি অসিঞ্চিত। তথাকথিত সবুজ বিপ্লব এই ত্রিশ ভাগ সিঞ্চিত জমিতে সীমিত। সিঞ্চিত জমিতে ফসলের ফলন অদূর ভবিষ্যতে বাড়বে তা নয় বরং কমবে। বহুদিন ধরে ভারত সরকার ও ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ অসিঞ্চিত জমিতে ফলন বাড়ানোর জন্য অনুসন্ধানের ওপর জোর দিচ্ছেন। কিন্তু রিসার্চও হচ্ছে কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। অনুসন্ধানকারিদের যে দিকেও দেখা উচিত—অতীতের সব পদ্ধতিই বর্জনীয় নয়—তবে হয়ত উন্নয়ন সাপেক্ষ। সিঞ্চিত ক্ষেত্রেও রাসায়নিক সারের পরিমাণ জমিয়ে জৈব সারের পরিমাণ বাড়ালে কম রাসায়নিক সারে অপেক্ষাকৃত কম খরচে উৎপাদন বৃদ্ধি

সম্ভব। প্রান্তিক জমিতে তৃণভূমিতে পরিণত করলে বা গাছ লাগালে জমির উর্বরতাশক্তি বাড়বে এবং পশুপালন বা হাঁস মুরগী পালন, গ্রহণ করে নীচু জমিতে পুষ্করিণী খনন করে জল সঞ্চয় করে সেচ ও বাদ চাষ করে গ্রামের মানুষ শুধু আহার্যের পরিমাণই বাড়াতে পারেন তা নয় অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্যের সন্ধান করতে পারেন। কৃষি বৈজ্ঞানিকদের উচ্চফলনশীল বীজ, সেচ, কীটনাশক বা অন্যান্য নিবারণকারী ঔষধ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের পরিবর্তে কিভাবে অসিঞ্চিত জমিতে "ট্রাডিশনাল" কৃষি পদ্ধতির উন্নয়ন সম্ভব সে দিকে বেশী নজর দিতে হবে এবং এর সাফল্য নির্ভর করবে—ল্যাবরেটরিতে রিসার্চ করে নয়—কৃষকের সঙ্গে মিলেমিশে তাদের সাহায্য নিয়ে ক্ষেতে খামারে কাজ করার মাধ্যমে আর প্রয়োজন মূলত কৃষি ক্রান্তির—অসিঞ্চিত জমির ফলন বাড়ানো প্রান্তিক জমির উপযুক্ত ব্যবস্থার মূল্যায়ন ও প্রযুক্তির পরিবর্তে যথাসম্ভব মানুষের শ্রমশক্তির বিনিয়োগ—গ্রামীণ মানুষের মুখে অন্ন যোগানই নয়—তাদের কাজও দিতে হবে—

শুধু সামাজিক ন্যায়ের জন্যই নয় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আমূল ভূমি সংস্কার প্রয়োজন। ভূমি সংস্কারে ভারতের মধ্যে পশ্চিম বাংলা অগ্রণী। বর্গাদারদের নথীভুক্ত করে তাদের জোত জমিতে তাদের অধিকার দেওয়ার ফলে যে বর্গাদার বীজ, সার, লাঙ্গল নিজেই করেন জমির পরিচর্যা, উপযুক্ত ফসলচক্রে বিন্যাসের ফলে তাঁর জমিতে যত ফলন হয়—যে বর্গাদার বীজ, সার ইত্যাদির জন্য জমির মালিকের ওপর নির্ভর করতে হয় তার ফলন অপেক্ষাকৃত কম হয়। বর্গাদারদের ক্ষেত্রে মহাজন সম্পূর্ণ বিলোপ করে তাদের সময়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিলে জমির ফলন আরো বাড়বে। জোতদারদের উদ্বৃত্ত জমি অধিগ্রহণ করে ভূমিহীনদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জমি পাওয়ার ফলে সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা কিছু বেড়েছে ঠিকই কিন্তু জমির যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না। জমির মালিকরা নিজেদের জন্য ভাল জমি সংরক্ষিত রেখে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রান্তিক জমি সরকারকে হস্তান্তরিত করেছেন। সরকারও এই সব জমি ছোট ছোট খণ্ডে ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করেছেন। অধিকাংশ জমিই চাষের অযোগ্য এবং অধিকাংশ ভূমিহীনের পক্ষে চাষের জন্য লাঙ্গল, বীজ ইত্যাদির বন্দোবস্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। এই জমিতে একফসলী যৌথভাবে ঘাস বা গাছ লাগালে এবং পশুপালন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজের সংস্থান সম্ভব হয় এবং জমির উর্বরাশক্তিও বৃদ্ধি পায়। আমূল ভূমি সংস্কারের লক্ষ্য থাকা উচিত সম্পূর্ণ মহাজন লোপ করা এবং জমির সদ্ব্যবহারের সুষ্ঠু সামগ্রিক পরিকল্পনার প্রস্তুতি যার মূলে থাকবে জমির উপযুক্ত ব্যবহার—ভূমি সংরক্ষণ এবং মাটি ও জলের সুষ্ঠু ব্যবহার।

রাসায়নিক সারের ব্যবহার সম্পূর্ণ বন্ধ করা সম্ভব নয় বা প্রয়োজনীয় নয়। অনেক কৃষক মনে করেন সার গাছের খাবার—গাছ কিন্তু খাবার আহরণ করে মাটি থেকে। মাটিতে জৈব সারের সঙ্গে কম পরিমাণ রাসায়নিক সার দিলে জৈবিক প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের যে খাদ্য প্রস্তুত হয় তা গাছ সহজেই গ্রহণ করতে পারে। অধিক ফলনশীল বীজের প্রয়োজন সেচ ও অধিক পরিমাণ রাসায়নিক সার। রাসায়নিক সার প্রস্তুতের কারখানা ছিল উন্নত দেশগুলিতে। বিকাশশীল দেশগুলিতে বাজার তৈরী হল। প্রথমে সার ও পরে প্রযুক্তি রপ্তানি করে উন্নত দেশগুলির আয়ও শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। প্রযুক্তি আমদানি করে ভারতে সারের কারখানা তৈরী হল। শুধু সার বিক্রেতারাই নয় সরকারও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ওপর জোর দিতে লাগলেন। এমন পরিবেশ তৈরী হল রাসায়নিক সার ব্যবহার না করলে ফলন কমে যাবে—দেশে খাদ্য সঙ্কট দেখা দেবে। আগেই বলা হয়েছে অধিক ফলনশীল বীজের ব্যবহার করা হচ্ছে দেশের ৩০ ভাগ সিঞ্চিত

ক্ষেত্রে। ভূমির অবক্ষয় ছাড়াও প্রাকৃতিক কারণে ফলন বৃদ্ধির একটা সীমা আছে—আমরা প্রায় সেই সীমায় পৌঁছে গেছি—ফলন বৃদ্ধির জন্য—প্রয়োজন অসিঞ্চিত চাষের পদ্ধতির উন্নয়নের, এ বিষয়ে সরকার মাঝে মাঝে কৃষি বিজ্ঞানীদের তাগিদও দিচ্ছেন কিন্তু যে লক্ষ লক্ষ কৃষিজীবি এ কাজে নিযুক্ত তাদের সঙ্গে বিজ্ঞানীদের বা কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকদের যোগাযোগ অত্যন্ত ক্ষীণ। ইউরোপ ও আমেরিকার কিছু সংখ্যক কৃষক জৈব সার ব্যবহার করছেন তাঁরা সবুজ সার—জন্তু জানোয়ারের মল এবং জৈবিক আবর্জনা ব্যবহার করছেন। কিন্তু সংখ্যক কৃষক সমুদ্রের আগাছা ও মাছের বর্জিত অংশও ব্যবহার করেন। ভারতবর্ষে গবাদি পশুর সংখ্যা পৃথিবীর অন্য দেশের তুলনায় সব চেয়ে বেশী। গোবর, মানুষের মল মূত্র, কচুরীপানা ইত্যাদি থেকে জ্বালানী গ্যাস ও উৎকৃষ্ট জৈবিক সার পাওয়া যায়। জ্বালানী সমস্যার সমাধান হলে গাছ কাটাও কমবে, জৈবিক সার জমির উর্বরতা বাড়বে ও গাছকে খাদ্য যোগানোর সহায়ক হবে। জৈব সার প্রয়োগ করলে রাসায়নিক সারের প্রয়োজন অনেক কমবে, জমির অবক্ষয় বন্ধ হবে, পরিবেশ দূষণ অনেক কম হবে।

আমাদের দেশে পরিমিত সেচের ওপর এখনও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। বৃহৎ নদী ঘাটি যোজনার সিঞ্চিত ক্ষেত্রে এবং খরাপ্রবণ এলাকায় জলের অপব্যয় বন্ধ করা নিতান্ত প্রয়োজন। অপরিমিত ও অনিয়ন্ত্রিত সেচের জলের ব্যবহারের ফলে জমি লবণাক্ত হচ্ছে, ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। সেচ নিয়ন্ত্রণ ও ফসলের ফলন বৃদ্ধি এবং এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য বৃহৎ নদী ঘাটি এলাকায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 'কমাণ্ড এরিয়া ডেভেলপমেণ্ট অথরিটি' নিয়োগ করেছেন। 'ফিল্ড চ্যানেলের' মাধ্যমে সেচের জল নিয়ন্ত্রণ, টিউবওয়েল দিয়ে জল উত্তোলন করে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে লবণের পরিমাণ কমান এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য—দুঃখের বিষয় এই পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়নি। আগেই বলা হয়েছে কিভাবে অপব্যবহারের ফলে পশ্চিমবাংলার নদীমাতৃক এলাকাতেও গ্রীষ্মকালে বহু জায়গায় ভূগর্ভস্থ জলস্তর নেমে যাচ্ছে—ফলে পানীয় জলের অভাব দেখা দিচ্ছে।

১৯৮৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিল' -এর আধুনিক কৃষিকাজে বৈকল্পিক কৃষি উৎপাদনের সুপারিশ থেকে প্রগতিশীল দেশের কৃষি বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টিভঙ্গী যাচাই। তাঁরা মূলতঃ উপযুক্ত ফসল চক্র প্রবর্তন, ভূমি ও জল সংরক্ষণ ও ফসলের স্বাস্থ্য রক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন—যার ফলে আগাছা ও ফসলের রোগ ও কীট পতঙ্গের আক্রমণ রোধ করা এবং বাতাস থেকে নাইট্রোজেন আহরণ করে রাসায়নিক সারের ব্যবহার করা এবং উপযুক্ত চাষের পদ্ধতি যার ফলে মাটি ও জল সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। তাঁরা পশুপালন এবং পশু স্বাস্থ্যের ওপরও জোর দিয়েছেন।

প্রখ্যাত কৃষি বৈজ্ঞানিক ডাঃ এম. এস. স্বামীনাথনের মতে জাতীয়স্তরে সংরক্ষণশীল কৃষি প্রবর্তনের জন্য তিনটি বিষয়ের ওপর বিশেষ ধ্যান দেওয়া প্রয়োজন। প্রথম, বনজ সম্পদ সংরক্ষণ এবং পুনরুজ্জীবন। দ্বিতীয়, কম জমিতে অধিক শস্য ও পশুখাদ্যের জন্য কৃষি প্রযুক্তির উন্নয়ন যার ফলে মাটি, জল, বায়ুর সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে।

শিক্ষিত যুবকদের গ্রামের কাজে ফিরিয়ে আনার জন্য—কৃষি ও অন্যান্য গ্রামীণ কাজকর্ম অধিক অর্থকরী ও বুদ্ধিজীবিগ্রাহ্য হওয়া দরকার। তৃতীয় দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টির ফলে শিশু মৃত্যুর

হারের নিয়ন্ত্রণ। ডাঃ স্বামীনাথন বলেছেন "অধিক শক্তি।" রাসায়নিক পদার্থ, জল এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে শস্যের ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। এখন প্রয়োজন বিকল্প ব্যবহার প্রবর্তন যার ফলে জমির উর্বরাশক্তি ব্যাহত না করে প্রয়োজনীয় শস্য উৎপাদন সম্ভব। তাঁর মতে প্রতি এলাকার কৃষকদের সঙ্গে যৌথভাবে মিলিত হয়ে তাদের গ্রহণযোগ্য কৃষি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। তিনি আরও মনে করেন দেশের জন সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করতে পারলে কৃষি সংরক্ষণও সম্ভব হবে না।

ভালবাসা

সৈয়দ হাবিবুল হাসান

বর্ষার শেষ রাতে,
সতেজ ঘাস আর
লাল কাঁকুরে, ভেজা পথ
পেরিয়ে অনেক দাদা উঁচু
নারকেল গাছ—
শির—শির—আওয়াজ তার
শন্—শন্—শন্।
দারা শরীর জোড়া
ভালবাসা এমেছি ঘরে।
ভীষণ ব্যস্ত বাবুরুম,
পরিচর্যায় তুমি।

□

মারাত্মক দুর্ঘটনা আইন

শঙ্কর কুমার সান্যাল

"The Fatal Accident Act"—অর্থাৎ বাংলায় 'মারাত্মক দুর্ঘটনা আইনটি' ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের অর্থাৎ স্বাধীনতা পূর্ব ভারতের আইন, এই আইনটি ভারতের সর্বত্র, কেবলমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া বর্তমানে প্রযোজ্য। যখন কোন ব্যক্তি তাঁর অবহেলা বা কোনো রূপ দোষ অথবা অন্যায় বেআইনী আচরণের দ্বারা অপর কোন ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হন, দুর্ঘটনায় আহত হন, তখন তাকে দুর্ঘটনা আইনের আওতায় আনা যায়। দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে আইনমাফিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং তার পরিবারবর্গের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে নিকটতম তাঁরাই ক্ষতিপূরণ ও অর্থ সাহায্য পাওয়ার অধিকারী হবে।

ক্ষতিপূরণ কত পরিমাণে দেওয়া হবে—তা নির্ধারণ করবে আদালত। একটির বেশী মামলা অভিযোগকারী আনতে পারবেন না। ১৮৫৫ সালের আইনে বলা হয়েছিল যে, যে ব্যক্তির জন্য বা যে ব্যক্তির তরফ থেকে আদালতে মামলা করা হবে, তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় প্রদান করতে হবে এবং ক্ষতিপূরণের বরণ ও পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। "Parent" শব্দটির দ্বারা পিতামাতা, পিতামহ-মাতামহ এবং "Child" শব্দটির দ্বারা পুত্র, কন্যা, নাতি-নাতনি, "Stepson" "Step daughter" দ্বারা বৈমাত্রেয় পুত্র কন্যা বোঝাবে।

"আহত" শব্দটির অর্থ শারীরিক আঘাত কোন দুর্ঘটনার কারণে ঘটে। এইরকম ব্যক্তিগত আঘাত এর মধ্যে পড়ছে নার্ভাস শক বা মানসিক যন্ত্রণা। ১২৬১ খৃষ্টাব্দে "Indian New Chronicle বনাম Mrs. Lazarus মামলায়, এক বৈদ্যুতিক কর্মী, যাঁকে মাঝে মধ্যে শীতল প্রকোষ্ঠ থেকে উষ্ণ প্রকোষ্ঠে যাতায়াত করতে হতো। মিঃউমোনিয়ায় পড়েন—তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই রায় প্রদান করা হয়েছিল যে দুর্ঘটনার ফলে যে আঘাতের সৃষ্টি হয়, তা শারীরিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিটির মৃত্যুর কারণ উষ্ণ ঘর থেকে শীতল ঘরে যাওয়া এটি তাঁর কর্তব্য।

দুর্ঘটনা ব্যক্তিগত আঘাত অবশ্য অবশ্যই কোনো দুর্ঘটনার দ্বারা ঘটবে, "দুর্ঘটনা" শব্দটি আইনের ধারায় সঙ্গা দেওয়া হয়নি। দুর্ঘটনা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা অনুযায়ী বিবেচনা করতে হবে কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা, যার সম্পর্কে পূর্ব থেকে কোনোরূপ ধারণা করা যায় নি। Accidental injury-র ব্যাখ্যায় ১৯৭৬ সালে শ্রীমতী সুন্দরবাই বনাম জেনারেল ম্যানেজার অরডিনান্স ফ্যাকটরী-জব্বলপুর মামলায় মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের ঘোষণা "Accident" ও "Injury" হলো শারীরিক আঘাত অবস্থা, যখন শ্রমিক মই থেকে পতিত হয়, তখন আঘাত শারীরিক, দুর্ঘটনা মানুষের অন্তরেও ঘটে Accident ও Injury তখন মিলে যায়। কর্মরত অবস্থায় শ্রমিকের হৃৎযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে, কর্মরত অবস্থায় যদি রোগ সৃষ্টি হয়, তবে শারীরিক আহত অবস্থা বলে গণ্য হবে, যদি কর্মের প্রাক্তিক চাপের ফলে আঘাতের মাত্রা ক্ষত হয়, বৃদ্ধি পায়, শ্রমিককে প্রমাণ করতে হবে যে কর্মের জন্যই অসুস্থতার সৃষ্টি হয়েছে।

"Accident" শব্দটির মধ্যে যে কোন ধরণের Injury কে বোঝানো হয়। স্বানকী আম্মল বনাম ইঞ্জিনীয়ারিং হাইডেন্ট কমিকোপ মামলায় বলা হয়েছে যে, শ্রমিক যদি পূর্ব থেকে কোনো দুর্ঘটনা সম্পর্কে ধারণা করতে না পারে—তবে দুর্ঘটনা বলে গণ্য হবে। 'Injury Accident যে কোনো বাইরের উপাদান যার ফলে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, অন্তর্নিহিত শারীরিক কারণ থাকা সত্ত্বেও, এই রায় দেওয়া হয়েছিল, The Municipal Corporation for Greater Bombay বনাম Smt. Sulochanabai Sadashiv Joil—১৯৭৭ সালে।

নিয়োগকারী, নিয়োগকর্তা, মালিক এই বিষয়ে দায়বদ্ধ। যদি দুর্ঘটনা ঘটে কর্মরত অবস্থায় শ্রমিক হৃদযন্ত্রনিত রোগে পীড়িত থাকে, কর্মের পরিশ্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে দুর্ঘটনাকে পরোক্ষ কারণের মধ্যে গণ্য করা হবে। এই রায় দেওয়া হয়েছিল লক্ষীবাই আত্মারাম বনাম বোম্বে পোর্ট ট্রাস্ট ১৯৬৪ মামলায়। শ্রমিক যদি রোগে পীড়িত থাকে, কর্মজনিত পরিশ্রমের ফলে মৃত্যুবরণ করে তবে মালিক দায়ী নয়, তবে শ্রমিক-এর কর্মবরণ-এর উপাদান ও মৃত্যুর পক্ষে সহায়ক হয় তবে মালিক দায়ী।

Potavarapu বনাম Andhra Pradesh Road Transport Corporation, হায়দ্রাবাদ মামলা (১৯৮৭) বলা হয়েছিল, Fatal Accident Act-১৯৫৫ সূলত: English Fatal Accident Act লর্ড ক্যাম্পবেলস এ্যাক্ট নামে পরিচিত। ১৯৫৮-তে এই আইন পণ্ডিচেরীতে সম্প্রসারিত হয়েছে।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে অথবা তাঁর তরফ থেকে নিম্নোক্তিত ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিনিধি আদালতে প্রমন্ত উপাপন করতে পারে। আদালত বিবেচনা অনুসারে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন।

মধ্যপ্রদেশের হাইকোর্টের একটি মামলায় (১৯৮০, ১৯৮৩) বলা হয়েছিল, ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হলেন স্বামী, স্ত্রী, পিতা-মাতা, পুত্র-কন্যা, মানসিক বা আবেগজনিত কারণে যে ক্ষতি তা পূরণ করা সম্ভব নয়, ক্ষতিপূরণ এই জন্যই দেওয়া হয় যে, মৃত ব্যক্তির দ্বারা যে অর্থ ভবিষ্যতে উপার্জিত হতে পারতো, তা থেকে তাঁর নিকটতম ব্যক্তিরা বঞ্চিত হলো। মৃত ব্যক্তি যে অর্থ উপার্জনের অধিকারী সেইটাই এখানে বিবেচ্য। তিনি ভবিষ্যতে সম্ভাব্য কি উপার্জন করতে পারতেন তা নয়। ক্ষতিপূরণ-এর উদ্দেশ্য যে, মৃত ব্যক্তির অভাবে যেন তাঁর পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের অসুবিধা না হয়।

ম্যাকক্লি বনাম আইজাক মামলায় বলা হয়েছিল যে কর্মজনিত ত্রুটির ফলে এবং কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে-এটি একটি সর্ত, মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যদি না শ্রমিক নিজের ত্রুটির জন্য দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়।

"Dudhiben Dharamshi-বনাম New Jehangir Vakil Mills Co. Ltd." ১৯৭৭ মামলায় গুজরাট হাইকোর্ট রায় দিয়েছিলেন যে arising out of employment" যা কর্মের বহিরাগত কারণের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি কেবল কর্মের প্রকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়, ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যদি শ্রমিক তার কর্মজনিত পরিস্থিতির জন্য বিশেষ বিপদমাত্রার মধ্যে থাকে, তবে ও কর্মের বহিরাগত উপাদানের ফলে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলা যাবে।

দুর্ঘটনা কি কারণে ঘটেছে, সেই সম্পর্কে বিচার প্রতিটি ক্ষেত্রে আলাদাভাবে করতে হবে। আসাম হাইকোর্টের ডুল বেঞ্চ (এ. আই. আর ১৯৬৩) মামলায় এই রায় প্রদান করেছেন যে, কি কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেই সম্পর্কে নিম্নলিখিত কারণগুলি বিচার করতে হবে। (১) দুর্ঘটনার শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় ছিল। (২) দুর্ঘটনা ঘটেছিল শ্রমিক যে স্থানে কাজ করছিল সেখানে বা সেই অঞ্চলে।

আমরা ' Employment বা নিয়োগ' শব্দটি যে অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহার করি, তা থেকে প্রসারিত অর্থে এর ব্যবহার করতে হবে। যখন শ্রমিক কর্তব্যরত তখনই মাত্র নয়, এর জন্য তাকে যে কাজ পালন করতে হয়, তা ও বুঝান হয়। ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া বনাম শ্রীমতী নূরজাহান ১৯৭১ মামলায় এই রায় প্রদান করা হয়েছিল।

কারখানার সিলিংএর পরিষ্কার করার সময় যদি শ্রমিকের মৃত্যু হয়, তবে এই দুর্ঘটনা কর্মকালীন অবস্থায় ঘটেছে বলতে হবে। দেখতে হবে যে ঘটনাটি অপ্রত্যাশিত কিনা ও আঘাতপ্রাপ্ত ক্ষেত্রটি হবে নির্বিঘ্নযোগ্য। ঘটনাটি অবশ্যই নির্দিষ্ট স্থান ও কালের মধ্যে সংঘটিত হওয়া চাই।

'কর্তব্য' সম্পর্কে বারণটিও প্রনিধানযোগ্য, কর্তব্যের সময়সীমা কেবল শ্রমিকের কর্মসময়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্ঘটনা ও কর্মের মধ্যে একটি সরাসরি অবস্থাই থাকবে।

'Works Manager Carriage and Wagon Shop E.I.R.V. Mahavir' মামলায়—ওয়ার্কশপ রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিত, শ্রমিকটি কাজের একটি শহর থেকে আসতো রেলওয়ে প্রদত্ত কর্মচারীদের বিশেষ ট্রেনে করে। সাধারণতঃ কর্মচারীরা কারখানার পৌঁছাতে রেলওয়ে লাইন অতিক্রম করে, সাধারণতঃ তা ওভারব্রীজ ব্যবহার করতো না, একজন শ্রমিক তার কাজ শেষ করে যখন রেলওয়ে লাইন অতিক্রম করছিল, তখন সে একটি শান্টিং ইঞ্জিনে চাপা পড়ে যায় ও আহত হয়, এক্ষেত্রে Employer-কে দায়বদ্ধ করা হয়।

অন্য একটি ঘটনায়, একজন শ্রমিক লরী থেকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, লরীটি নিয়োগকর্তারই ছিল এবং তাঁর ড্রাইভার অর্থাৎ চালক লরীটি চালাচ্ছিলেন, শ্রমিকটিকে তার কর্মস্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, যেখানে নিয়োগকর্তা বা মালিকের প্রদত্ত যানবাহনই যাতায়াতের একমাত্র বাহন, সেখানে দুর্ঘটনাটি কর্মকালীন সময়ে ঘটিত বলে ধরে নেওয়া হবে।

অন্য এক মামলায় ১৯৫৮—Saurashtra Salt Mfg. Co. বনাম Bai Velu Raja—একজন শ্রমিক লবণ সংক্রান্ত কাজ থেকে ফেরার সময়ে (ফেরী নৌকার সাহায্যে ডুবে যায়। সাব্যস্ত হয়, দুর্ঘটনাটি কর্মকালীন সময়ে ঘটেনি, যেখানে নৌকাটি দুর্ঘটনায় পড়েছিল, ততদূর পর্যন্ত কর্মের পরিবেশ বিস্তৃত হতে পারে না।

আর একটি ক্ষেত্রে, একজন শ্রমিক কর্ম থেকে ফেরার সময় খুন হয়। খুনের সময় স্থানটি মালিকের অঞ্চলের মধ্যেই ঘটেছিল। সুতরাং দুর্ঘটনা ও কর্মের মধ্যে একটি সম্পর্ক রয়েছে—তার স্ত্রী ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।

কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য মালিক দায়বদ্ধ নন। (১) যেক্ষেত্রে ও দিনের বেশী আঘাতজনিত অক্ষমতা সঞ্চারিত হবে না। (২) যেক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটেনি—এমন আঘাতজনিত অবস্থা নিম্নলিখিত

কারণে ঘটেছে—(১) যেক্ষেত্রে দুর্ঘটনার সময় শ্রমিক নেশাকর পানীয় বা ঔষধ গ্রহণ করেছিল। (২) যেক্ষেত্রে শ্রমিক ইচ্ছাকৃতভাবে কোন আইন বা আদেশ অমান্য করেছিল বা সরিয়ে দিয়েছিল।

অন্য একটি ঘটনায় শ্রমিকদের নিষেধ করা হয়েছিল ইনটারভেল-এর সময় কাজ করতে, কারণ বিস্ফোরণ-এর ঝুঁকিসম্বলিত কারণ ছিল, বিপদসূচক সংকেত ঘোষিত হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও একজন শ্রমিক অন্যের মতো সেইস্থানে থাকার মানসিকতা দেখিয়েছিল এবং দুর্ঘটনার পতিত হয়েছিল—সুতরাং ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হয়।

আর্থমুনি বনাম ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের মামলায় একজন শ্রমিক গগলস্ ব্যতিরেকে কাজ করছিল, আগুনের স্ফুলিঙ্গে দৃষ্টিশক্তি হারায়—যদিও ইংরাজীতে নোটিশে ঘোষণা করা হয়েছিল গগলস্ ব্যবহারের জন্য।

রক্ষাকবচের জন্য মালিককে প্রমাণ করতে হবে যে :—

১। যখন দুর্ঘটনা ঘটেছে—তখন আদেশ বা আইন চালু ছিল।

২। আইন বা আদেশের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের নিরাপত্তা।

৩। আদেশ বা আইন স্পষ্ট করে জানানো হয়েছিল।

৪। দুর্ঘটনার পতিত শ্রমিকটিরও গোচরে নোটিশ আনা হয়েছিল।

৫। কোনো ব্যক্তি এটি লঙ্ঘন করেছিল।

৬। ঐ ব্যক্তিটির দ্বারা নিয়মলঙ্ঘন ইচ্ছাকৃত ছিল—কেবলমাত্র ভুলবশতঃ অবহেলা বা জরুরীকালীন অবস্থায় কার্য করতে গিয়ে ঘটেনি।

৭। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আইন অমান্যের জন্য।

দুর্ঘটনার জন্য কি পরিমাণে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে—সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে উল্লিখিত হয়েছে। দুর্ঘটনার ফলে আংশিক বা পুরাপুরি অক্ষমতা সৃষ্টি হতে পারে। সেই অনুযায়ী ক্ষতি-পূরণ দেওয়া হবে। চিকিৎসার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়, তা কিন্তু ক্ষতিপূরণ বলে গণ্য হবে না।

মারাত্মক দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে কমিশনারের ক্ষমতা হয়েছে মালিকের কাছ থেকে একটি বিবৃতি আদায় করার। তিনি রেজিস্টার্ড পোষ্ট-এর সাহায্যে নিয়োগকারীর কাছে একটি নোটিশ পাঠাতে পারেন, যাতে ৩০ দিনের মধ্যে নিয়োগকারী একটি বিবৃতি দেবেন।

১। কি অবস্থায় শ্রমিকটির মৃত্যু হয়েছে, সে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী কিনা।

২। যদি নিয়োগকারী এই মত দেন যে, তিনি ক্ষতিপূরণ দেবেন, তবে নোটিশ পাওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে তার ব্যবস্থা করবেন।

৩। যদি তিনি মনে করেন যে, ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়, তবে তার কি কারণ তা দর্শাতে

৪। যদি নিয়োগকারী ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করেন, তখন কমিশনার অনুসন্ধান করে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের এ বিষয়ে অবহিত করতে পারেন, তাদের তথ্য সরবরাহ করতে পারেন—যদি প্রয়োজন অনুভব করেন।

ডাক্তারী পরীক্ষা—শ্রমিক দুর্ঘটনার বিষয়ে নোটিশ প্রদানের পর মালিক ৩ দিন অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই রোগী চিকিৎসকের দ্বারা, বিনা পয়সায় চিকিৎসার সুযোগ দিতে পারেন।

যদি দুর্ঘটনা প্রাপ্ত শ্রমিক চিকিৎসকের কাছে পরীক্ষা দিতে অস্বীকার করেন, তবে যে পর্যন্ত না সে রাজী থাকে পরীক্ষা করাতে, সে পর্যন্ত সে কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার দাবী করতে পারবে না।

আবার যতদিন পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করার ওপর স্থগিতাদেশ থাকে, ততদিন পর্যন্ত সে ক্ষতিপূরণ পাবে না।

কমিশনারের নিয়োগ পদ্ধতি :—

রাজ্য সরকার অফিসিয়াল গেজেটে ঘোষণার দ্বারা যে কোনো ব্যক্তিকে কমিশনার নিয়োগ করতে পারেন। যিনি শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থার তদারকী করতে পারেন। যেক্ষেত্রে কোনো অঞ্চলের জন্য একাধিক কমিশনার নিয়োজিত হন, সেখানে সরকার কোনো বিশেষ অথবা সাধারণ আইনের দ্বারা তাঁদের মধ্যে কার্যভাগ করে দিতে পারেন, প্রত্যেক কমিশনারই ভারতীয় পেনসন কোডের আওতায় একজন সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য হবেন।

কমিশনারের ক্ষমতা রয়েছে যে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ অথবা পছন্দ করার, যিনি অনুসন্ধান বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ, ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে কমিশনারের নিজস্ব এক্তিয়ার রয়েছে। তিনি নির্ধারণ করতে পারেন কোনো দুর্ঘটনায় পতিত শ্রমিক যথাযথ শ্রমিক কিনা, তাকে কি পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

আদালতের কার্য নির্ধারণ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, আইনের আক্ষরিক অর্থ বিচারের সময় বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে। হরেন্দ্র গঙ্গাধার দোষীর মামলায় ভারত সরকারের অতিরিক্ত সেক্রেটারী, নিউ দিল্লী, ১৯৮০ সালের মামলায় এটি বলা হয়েছিল।

১৯৩৯ সালের "মোটর ভেহিকেলস এ্যাক্ট" এর ক্ষতিপূরণ নির্ধারণকারী ট্রাইবুনাল-কে অনেক ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে চিহ্নিতকরণ ও ট্রাইবুনাল করতে পারে।

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে ১৬ই এপ্রিল '৯৪ প্রচারিত।

সংঘবার্তা

রাখালচন্দ্র দাস

৭ই মার্চ হরিজন সেবক সংঘের সম্পাদক শ্রী শঙ্কর কুমার সাক্সেনা বাঁকুড়ায় গান্ধী বিচার পরিষদের সম্পাদক শ্রী শিশির কুমার দাশগুপ্তের সাথে 'অস্পৃশ্যতা' সম্বন্ধে এক আলোচনায় মিলিত হন।

১১ই মার্চ হাওড়া চেম্বার অফ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজের সভাপতি শ্রী বৈদ্যনাথ মোদী, সহ-সভাপতি শ্রীমহাবীর প্রসাদ পোদ্দার, সাধারণ সম্পাদক শ্রী বাসুদেব টিকমানী, সম্পাদক শ্রী শঙ্কর কুমার সাক্সেনা, পশ্চিমবঙ্গ হোলিং মিলস্ এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী শ্যাম সুন্দর বেরিওয়ালা রাইটার্স বিল্ডিং এ মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসুর সাথে আলোচনার কেন্দ্রীয় বাজেটে ক্ষুদ্র শিল্প সংস্থার উপর ১০% বিক্রয় কর ধার্য করার বিরুদ্ধে শিল্প সংস্থাগুলোর সংকটজনক অবস্থার কথা তুলে ধরেন। শ্রী বসু এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং ক্ষুদ্র শিল্পের স্বার্থে সবরকম সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এই আলোচনায় রাজ্য অর্থমন্ত্রী ডঃ অমীয় দাশগুপ্ত, শিল্প পুর্নগঠন মন্ত্রী শ্রীপতিত পাবন পাঠক এবং হাওড়া কর্পোরেশনের মেয়র শ্রী সুদেশ চক্রবর্তীও অংশগ্রহণ করেন। পরে শ্রী বাসুদেব টিকমানী ও শ্রী শঙ্কর কুমার সাক্সেনা এক সাংবাদিক সম্মেলনে ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যাগুলো তুলে ধরেন।

১০—১২শে মার্চ মাদ্রাজের হোটেল কাকাতে জাতীয় 'অস্পৃশ্যতা' সম্বন্ধে এক আন্তর্জাতিক কর্মশালার বাংলা-বিহার বিকল্প অস্পৃশ্যতা প্রতিরোধ সমিতির পক্ষে বাঁকুড়া গান্ধী বিচার পরিষদের সম্পাদক শ্রী শিশির কুমার দাশগুপ্তের নেতৃত্বে আট সদস্যের এক প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মশালায় ভারতের চারটি আঞ্চলিক অস্পৃশ্যতা প্রতিরোধ সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ইউ. কে. ই. এর পক্ষে ডঃ বাদল সেনগুপ্ত, মিস্ সাবরেলী ফিসার ইউনিস, মিস্ এরিকা মারকে, মিঃ পিটার লানচেস্টার প্রমুখ প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। পাঁচদিন ব্যাপী এই কর্মশালায় অস্পৃশ্যতার প্রাথমিক কারণ এবং তা প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন দিক এবং জনসাধারণের মধ্যে এ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা সৃষ্টি করে তাদের মানবিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ণ কাজে নিযুক্ত করার প্রচেষ্টার সামিল করার আহ্বান জানান হয়। সমগ্র কর্মশালা পরিচালনা করেন প্রখ্যাত পরিবেশবিদ্ ডঃ বাদল সেনগুপ্ত এবং সংযোজনা করেন ডাইলগ গ্রুপের ডঃ জ্যোতিময় বসু রায়চৌধুরী। কর্মশালায় ডাঃ হরি ওম, সর্বশ্রী যোগেশ ওয়ালসারা, কল্পনাকরণ, সি রাধাকৃষ্ণণ, আদিত্য পট্টনায়ক, উইলিয়াম ক্যানলি, বেনেট বেঞ্জামিন, শৈলেন দাস, শঙ্কর কুমার সাক্সেনা, সুধীর অধিকারী রামমোহন চ্যাটার্জী রমেন শাহা, অমলেন্দু খান, পূর্ণেন্দু কুমার সহ বিভিন্ন রাজ্যের পঁচিশজন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

২৪শে মার্চ শিলুয়া অগ্রসেন সেবা সমিতি আয়োজিত মহিলাদের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী কে. ভি. রঘুনাথ রেড্ডি বলেন আজকের মহিলারা আরও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে এবং তার জন্য শিক্ষাবিস্তারের আরো বেশী প্রয়োজনীয়তা আছে। অনুষ্ঠানে রাজ্যের শিল্প পুর্নগঠন মন্ত্রী শ্রী পতিত পাবন পাঠক, কলকাতা

হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রী সুব্রত চ্যাটার্জী, হাওড়া কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীরমেন চক্রবর্তী, হাওড়ার জেলাশাসক শ্রীমতী রেখা মুখার্জী, বাকোর প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী, হোটারী ক্লাবের বাবা পর্তমর সহ আরও অনেকেই বক্তব্য রাখেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে প্রকল্পের সভাপতি শ্রী বাসুদেব টিকমানী তাঁর বক্তব্যে হাওড়ার পিছিয়ে পড়া মহিলাদের শিক্ষা বিস্তারে সংস্থার প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন হাওড়া চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রির সম্পাদক শ্রী শঙ্কর কুমার সান্যাল।

৫ই এপ্রিল হাওড়া জেলার ইতিহাস প্রণয়ন সমিতির এক সভা প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ডঃ অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অধ্যাপক ডঃ শঙ্করী প্রসাদ বসু, প্রখ্যাত চিকিৎসক ডঃ মীনবন্ধু ব্যানার্জী, আনন্দবাজারের সহ সম্পাদক ডঃ মিহির কর, প্রাক্তন অভয়মান শ্রী অশোক রক্ষিত, ডঃ প্রসাদ ব্যানার্জী, শ্রী শঙ্কর কুমার সান্যাল, শ্রী অনুপম মুখার্জী প্রমুখ অবিলম্বে হাওড়া জেলার ইতিহাস প্রণয়ন ও প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর জোর দেন।

৩—৭ই এপ্রিল চরিজন সেবক সংঘের সম্পাদক শ্রী শঙ্কর কুমার সান্যাল দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রক, হাজোয়রণ মন্ত্রক, সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা পর্ষদের অধিকর্তাদের সাথে রাজ্য সংঘের বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় মিলিত হন। আর্থিক বর্ষ সমাপ্ত হওয়ার পরেও বিভিন্ন প্রকল্পে টাকা সময়মত না পাওয়ায় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা যে সমস্ত অসুবিধায় পড়েন তা তুলে ধরেন।

১ই এপ্রিল কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের রক্তকরবীতে হাওড়া চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রির বার্ষিক সাধারণ সভা বিদায়ী সভাপতি শ্রী বৈদ্যনাথ ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক শ্রী বাসুদেব টিকমানী বিগত বর্ষের কার্যবিবরণী পেশ করেন। সভায় শ্রী মহাবীর প্রসাদ সারককে সভাপতি করে নতুন কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। সহ সভাপতি নির্বাচিত হন শ্রী বাসুদেব টিকমানী, শ্রী ইন্দানী নন্দী, শ্রী সুরেশ বনসাল, শ্রী মদনমোহন দত্ত। সাধারণ সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হন শ্রী শঙ্কর কুমার সান্যাল। সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে যথাক্রমে শ্রী রমেশ চন্দ্র আগরওয়াল ও শ্রী সীতারাম ডিবরেওয়ালা সহ ২১ জন নির্বাচিত সভাপতিকে নিয়ে পরিচালন পর্ষদ গঠিত হয়। নব নির্বাচিত সভাপতি শ্রী সারক এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রী শঙ্কর কুমার সান্যাল হাওড়ার শিল্প ও বাণিজ্যের বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ করে তার সমাধানের ব্যাপারে সকল শিল্পোদ্যোগীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

১৬ই এপ্রিল হাওড়া জেলার ইতিহাস প্রণয়ন সমিতি কর্তৃক প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ডঃ অমীয় কুমার ব্যানার্জী রচিত হাওড়া জেলার ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ মনীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী এবং প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত কবি শ্রীনীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী। বিচারপতি শ্রীসুব্রত চ্যাটার্জী, এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ডঃ চন্দন রায় চৌধুরী, প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ভোলানাথ চক্রবর্তী, ডাঃ মীনবন্ধু ব্যানার্জী ডঃ মিহির কর, প্রাক্তন মেয়র শ্রীঅলোকরঞ্জন দাস, ডাঃ প্রসাদ ব্যানার্জী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

২২শে এপ্রিল বৃহত্তর ভ্রাতৃসংঘের আহ্বানে দুর্গাপুর এলাকার একটি প্রকৃত খেলার মাঠের দাবীতে এক বিরাট নাগরিক কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীশঙ্কর কুমার সান্যাল। কনভেনশনে প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রমিক নেতা শ্রীনিমাই সাহা ও অন্যান্য বক্তৃগণ। দুর্গাপুর কর্পোরেশনের কাউন্সিলর শ্রীবিশ্বনাথ পাল, শ্রীহরিগোপাল চক্রবর্তী, শ্রীমতী প্রতিমা মজুমদার, সমাজসেবী শ্রীবীরেন্দ্র শর্মা, সংঘ সম্পাদক শ্রীবাদলচন্দ্র জানা, শ্রীদিলীপ মিত্র প্রমুখ এলাকার প্রকৃত খেলার মাঠের দাবীতে বক্তব্য রাখেন।

এপ্রিল ছত্রিজন সেবক সংঘ আয়োজিত সংবিধান প্রণেতা ডাঃবাবাসাহেব আম্বেদকরের জন্মদিন বিশিষ্ট সর্বোদয় নেতা শ্রীপুলিন বিহারী মহাপাত্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীনিরঞ্জন পট্টনায়ক ও শ্রীবিশ্বম্ভর দাস এবং প্রবীণ গঠনকর্মী শ্রীনরসিংহ চেট্টা, শ্রীমদনরাম, সাধকর্মী শ্রীসুভাষ চন্দ্র পট্টনায়, শ্রীঅজিত কুমার বেরা প্রমুখ ডঃ আম্বেদকরের জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। প্রধান বক্তাগ্রূপে সংঘ সম্পাদক শ্রীশঙ্কর কুমার সান্যাল ডঃ আম্বেদকরকে নবভারতের অন্যতম রূপকার রূপে চিহ্নিত করে বলেন—গান্ধীজী এবং আম্বেদকর উভয়েই উভয়কে স্ব-স্ব কর্মক্ষেত্রে সবচেয়ে শ্রদ্ধা করতেন এবং একে অপরের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে কাজ করে গিয়েছেন। আজ কেউ কেউ গান্ধীজীকে লোক চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা বিশ্বের কোন বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন মানুষই গ্রহণ করবে না। আমাদের সকলকে গান্ধী এবং আম্বেদকরের জীবন থেকে অনেক কিছুই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

৪ঠা মে ছত্রিজন সেবক সংঘের রাজ্য কার্যকরী সমিতির সভা কলকাতার মহাঃ সভাপতি প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীসুধাংশু চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সম্পাদক শ্রীশঙ্কর কুমার সান্যাল কার্যবিবরণী পেশ করে সংঘের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। সভায় সর্বশ্রীযুক্ত সংঘের সম্পাদক শ্রীঅরুনারায়ণ ব্যানার্জী, সর্বশ্রী নিখিল সান্যাল, নির্মল বসু, পুষ্পরঞ্জন চ্যাটার্জী, সুমনা চক্রবর্তী, লিখা সান্যাল, অরুণ রায়, হৈবাল কান্তি সেন প্রমুখ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

৪ঠা মে কুরাল ভেভালপমেন্ট কনসরটিয়ামের কার্যকরী সমিতির সভা শ্রীমতী এনা চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সাধারণ সম্পাদক শ্রীবিপ্লব হালিমের শারীরিক কারণে পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়। শ্রীশঙ্কর কুমার সান্যাল সর্বসম্মতিক্রমে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। সভায় সর্বশ্রী প্রদীপ চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ মুখার্জী, চন্দন পাল, হেমেন্দ্র বসু, সুশীল মাহা তারক সিনহা, শেখ আহমেদ, মৌসুমী সেনগুপ্ত, তপন সরকার, অধ্যাপক দীপক মুখার্জী, পার্থ মুখার্জী, রবীন্দ্রনাথ জানা, প্রমুখ বিভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক শ্রী সান্যাল বর্তমান আর্থ ভি দিন সংকটজনক পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কার্যকরী সমিতির সদস্য ও কর্মীদের সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন।

JATIYA SAMACHINTAN, MONTHLY. July 1984 Vol.-8 No. 11 Regn. No. 44055/80
Postal Regn. No. WB/HWH-47

"খাদি জনতার সেবা করে—খাদি কিনুন"—গান্ধীজী

গান্ধী স্মারকনিধি, বাংলা

১৪, রিভারসাইড রোড, পোঃ অঃ—বারাকপুর, ২৪-পরগণা

Central Library,
University of Calcutta,
CALCUTTA - 700 012.

খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন অনুমোদিত খাদিভবন থেকে সুতী-খাদি, সিল্ক-খাদি বস্ত্র এবং গ্রামোদ্যোগী জিনিষপত্র কিনে পল্লীবাংলার দরিদ্র কাটুনী ও অন্যান্য কারিগরদের অন্ন-সংস্থানের সহায়তা করুন

—: প্রতিষ্ঠান :—

গান্ধী স্মারকনিধি খাদি গ্রামোদ্যোগ ভবনসমূহ

(১) ৮১, এস. এন. ব্যানার্জী রোড,
চিত্তিরামোড়, বারাকপুর,
২৪ পরগণা,

(২) ৩৮, কে. এম. পাল স্ট্রীট,
শ্রীরামপুর, হুগলী

(৩) ৪৭/এ/৩, জি. টি. রোড,
কাশীতলা, শ্রীরামপুর,
হুগলী

(৪) সামন্ত বাজার
সিউড়ী, বীরভূম।

(৫) ১১/১ নরসিংহ দত্ত রোড,
কদমতলা,
হাওড়া

(৬) ৩৮, অরবিন্দ রোড,
নৈহাটি,
২৪ পরগণা

(৭) জি. দাস বিল্ডিং
১২, রেল গেট
বারাসাত, জেলা-২৪পরগণা।

Jatiya Samachintan is published by Smt. Shikha Sanyal from 97/3, Nasharpara Road, Howrah-711107 and Printed by her at Print Service, 91, Nasharpara Road, Howrah-711107